Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ
আল-কুরআন ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তালিবের নাম - আঁখি আক্তার
রোল - ২১৬০২১০৬২

তারিখঃ ২৯ মে, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

জমা দিয়েছেনঃ

ত্বলিবের নাম - আঁখি আক্তার
রোল - ২১৬০২১০৬২

ত্বত্তাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ
আল-কুরআন ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আঁখি আক্তার, আইডিঃ ২১৬০২১০৬২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ
আল-কুরআন ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম
ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “রাসূল (সাঃ) এর মোজেযা” শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মামুনুর রশিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

আঁখি আক্তার

(স্বাক্ষর)

আঁখি আক্তার

আইডিঃ ২১৬০২১০৬২
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ
২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা --- ৫

রাসূল (সাঃ)-এর মোজেযা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস -------------------------------------- ৭

নবী হওয়ার আগেই রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ যে মুজেযা দান করেছিলেন -------------- ১০

অলৌকিক ওহী --- ১৩

রাসূল (সাঃ) এর অনন্য মুজেযা পবিত্র কুরআন -- ১৮

রাসূল (সাঃ) এর অসাধারণ মহৎ চরিত্র – এটাও এক মুজেযা --------------------------- ২৫

রাসূল (সাঃ) এর জীবনের কিছু মুজেযা --- ৩১

রাসূল (সাঃ) এর বরকতময় দোয়া -- ৪২

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন ------------------------------ ৪৭

রাসূল (সাঃ) কে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয় --------------------------------------- ৫০

উপসংহার -- ৫৭

ভুমিকা

মুজিযা বা কারামত হলো নবী-রাসূল-অলিদের প্রতি আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা ইসলামের প্রয়োজনে তার ইচ্ছামাফিক এই ক্ষমতা নবী-রাসূল বা অলিদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এটি ব্যক্তিবিশেষকে দেখানো বা ক্ষমতা জাহির করার কোনো বিষয় নয়। নবী-রাসূল থেকে প্রকাশিত অলৌকিক বিষয়াবলিকে মুজিযা বলা হয়। আর নবী-রাসূল ব্যতীত অন্যদের থেকে প্রকাশিত অলৌকিক বা আশ্চর্যজনক ঘটনাকে কারামত বলা হয়।

মুজিযা আরবি শব্দ। এর অর্থ অভিভূতকারী। বস্তুত অলৌকিক কোনো কাজের পারিভাষিক শব্দরূপে মুজিজা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মুজিযা হলো নবী-রাসূলের নিজস্ব দাবির সমর্থনে এমন অলৌকিক ও আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে দেখানো, যা নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে ঘটানো আদৌ সম্ভব নয়। নবী-রাসূলের বাইরে কামেল বুজুর্গদের মাধ্যমে অলৌকিক কার্য সম্পাদন হলে তাকে বলা হয় কারামাত।

যেমনিভাবে রাতের অন্ধকারের পর দিনের আলো আসাটা কুদরতি নিয়ম। ঠিক তেমনিভাবে এটাও আল্লাহ তাআলার ফয়সালা যে, যখন মানবজাতির ওপর পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহির কালো আঁধার ছেয়ে যায়, তখন আল্লাহতাআলা হেদায়েতের সূর্য উদিত করেন। মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূলদের আল্লাহতাআলা নিজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন। আল্লাহতাআলা তাদের এমন কিছু অলৌকিক শক্তি দান করেন, যা সাধারণত মানুষকে দেন না। তাদের এমন চক্ষু দেওয়া হয়ে থাকে যা অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। নবী-রাসূলগণ এমন কিছু দেখেন যা আমরা দেখি না। তারা এমন কিছু শোনেন যা আমরা শুনি না। মানুষের ফিতরি তাকাজা পূর্ণ করা ও তাদের অন্তরকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য নবী রাসূলদের থেকে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে যা সাধারণ মানুষের জন্য অসম্ভব। যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্য আগুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, হজরত মুসা (আ.)-এর লাঠি বিশাল বড় সাপ হয়ে যাওয়া, হজরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ছাড়া জন্ম হওয়া এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করা এ সমস্ত ঘটনা মানুষের বিবেক দ্বারা বোঝা অসম্ভব। এগুলোকেই ইসলামী পরিভাষায় মুজিযা বলা হয়।

মুজিযা মূলত নবী-রাসূলের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহর সাক্ষ্য। বিষয়টি এভাবেও বলা যায়, যিনি নিজেকে আল্লাহর নবী দাবি করেন, তার সত্যতা প্রমাণ করাই মুজিযার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসূলদের বিভিন্ন মোজেযা দান করেছেন। যেমন ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। হযরত সুলাইমান (আ.) বাতাসকে বশীকরণ করতে পারতেন। তিনি পাখি ও পিঁপড়ার ভাষাও বুঝতেন। জিনদের দিয়ে কাজ করাতেন।

আমাদের নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময়ে ধরাতে আগমন করেছেন, যখন সারা দুনিয়া মূর্খতা ও গুমরাহির অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি (সাঃ) এই অন্ধকারকে একত্ববাদ ও ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দিয়েছেন। এই দায়িত্বপালনকালে রাসূল (সাঃ) থেকে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (সাঃ) এর অলৌকিক ঘটনাসমূহ বলতে সেই সকল অতিপ্রাকৃত তথা কার্যকারণসূত্রবিহীন ঘটনাবলীকে বোঝানো হয় যেগুলো ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দ্বারা তার জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় নবী-রাসুল কর্তৃক প্রদর্শিত এরূপ অলৌকিক ঘটনাসমূহকেই মুজিযা বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন অসংখ্য মুজিযার অধিকারী। তবে রাসূল (সাঃ) এর মুজিযার প্রকৃত সংখ্যা কত, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। এ প্রসঙ্গে ইমাম বাইহাকি (রহ.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা হলো এক হাজার। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা হলো এক হাজার দুইশত। আবার অনেক মনীষী বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযা তিন হাজার। (সূত্র: ফতহুল বারি) । সর্বোপরি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য-অগণিত মুজিযা রয়েছে। যা লিখে বা বর্ননা করে শেষ করা সম্ভব নয়।

যে কোনো নবীর চেয়ে অলৌকিক ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল বিশ্বনবী (সাঃ) এর ক্ষেত্রে এবং এইসব ঘটনা ছিল অনেক বেশি বিস্ময়কর। এর কারণ, বিশ্বনবী (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর ওপর নাজিল হওয়া ধর্ম বা শরীয়তও সবচেয়ে পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আর এই ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত বা বিশ্বের শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে ও শক্তিশালী হয়ে থাকবে। অন্য নবী-রাসূলরা এসেছিলেন বিশেষ জাতি ও বিশেষ সময়ের জন্য। কিন্তু ইসলাম এসেছে সব মানুষ ও জ্বিনের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

বর্তমানে কারো পক্ষে মুজিযা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। কেউ আশ্চর্যজনক কিছু করলে বা করে দেখালে সেটা হবে তার কারামত। কারণ, মুজিযা নবী-রাসুলদের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু দুনিয়ায় নবী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই মুজিযাও বন্ধ হয়ে গেছে।

রাসূল (সাঃ)-এর মোজেযা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস

আল্লাহ কিছু রাসূলকে অলৌকিক কাজ করার শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন। অলৌকিকত্ব বা মুযেজা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর এক চ্যালেঞ্জ। এটা এমন এক ব্যপার যা মানুষ নিজের শক্তিতে করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই হতে পারে। মুযেজা হলো এমন এক অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক ব্যপার যা মানুষের উপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলে। এর দুই রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১. যারা বিশ্বাসী তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়

২. অনেক অবিশ্বাসী ঈমান আনে।

যারা মুযেজায় বিশ্বাস করতো না, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয় একই ধরণের কিছু করে দেখাতে। যখন তারা তা পারলো না, তখন আল্লাহর কালামে তা প্রকাশিত হয় ও অবিশ্বাসীদের ব্যর্থতা উন্মোচিত হয়। আল্লাহ যে মুযেজা রাসূলদের দান করেছিলেন - নবী ও রাসূলদের জীবনের অনেক ঘটনা বিস্তারিতভাবে কোরআনে বলা হয়েছে।

মানুষ রাসূল (সাঃ)-এর মোজেযা সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা করে তার সবকিছু ভুল নয়। আবার সব সত্যও নয়। এক্ষেত্রে নিজেদের আবেগ এবং বিবেককে সত্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি নির্ধারণ করা ঠিক নয়; বরং এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও সহীহ হাদীসের স্মরণাপন্ন হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

রাসূল (সাঃ)-এর মোজেযা সম্পর্কে তিন শ্রেণীর মানুষ পাওয়া যায়।

১) এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা সকল প্রকার মোজেযাকে সত্য বলে মনে করে। যেসব মোজোযার কথা মানুষের মুখে বা কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায় তা সবই তারা বিশ্বাস ও গ্রহণ করে। সকল প্রকার যঈফ বর্ণনাও তারা বিশ্বাস করে। সেসব বর্ণনা ইসলামের সার্বিক দৃষ্টিভংগীর সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক।

২) অন্য এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা সকল প্রকার মোজেযাকে অবিশ্বাস করে। তারা মনে করে, রাসূল (সাঃ)-এর একমাত্র মোজেযাই বিশ্বের মানুষদের চ্যালেঞ্জের ক্ষমতা রাখে। মক্কার কাফের এবং কোরায়শদেরকে যখন আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, তারা যেন এই কোরআনের মতো একটি সূরা বা একটি আয়াত তৈরী করে আনে। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তারা ব্যর্থ হয়েছিলো। মক্কার কাফের মোশরেকরা যখন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে মোজেযা দাবী করেছিলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এরা বলে, আমরা কখনোই তোমার ওপর ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে এ যমীন থেকে এক প্রসবণ (ধারা) উৎসারিত করবে, কিংবা তোমার জন্যে খেজুরের অথবা আংগুরের একটি বাগান (তৈরী) হবে এবং তাতে তুমি অসংখ্য নদী নালা বইয়ে দেবে, অথবা যেমন করে তুমি (কেয়ামত সম্পর্কে) বলো, সে অনুযায়ী আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) ফেরেশতাকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে, কিংবা থাকবে তোমার কোনো স্বর্ণ নির্মিত ঘর অথবা তুমি আরোহণ করবে আসমানে; তারপরও আমরা কিন্তু তোমার (আকাশে) চড়ার ঘটনাকে বিশ্বাস করবো না, যতোক্ষণ না তুমি (সেখান থেকে) আমাদের জন্যে একটি কিতাব নিয়ে আসবে, যাকে আমরা (নাযিল হতে দেখে) পড়তে পারবো। (হে নবী,) তুমি (এদের শুধু এটুকু) বলো, মহান পবিত্র (আমার) আল্লাহ তায়ালা, আমি তো কেবল একজন মানুষ (ও) রাসূল বৈ কিছুই নই।'

(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৯০-৯৩)

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাফের কোরায়শদের দাবী প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

'আমাকে (আযাবের) নিদর্শনসমূহ পাঠানো থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নিবৃত করতে পারেনি যে, তাদের আগের লোকেরাও তা অস্বীকার করেছিলো। আমি সামুদ জাতিকে দৃশ্যমান নিদর্শন (হিসেবে) একটি উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা (আমার) সে (নিদর্শনের) সাথে যুলুম করেছে, (আসলে) আমি ভয় দেখানোর জন্যেই (তাদের কাছে আযাবের) নিদর্শনসমূহ পাঠিয়ে থাকি।' (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৫৯)

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মোজেযা দাবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কোরআন নাযিল করেছেন। এই কোরআন একাই সকল মোজেযার মোকাবেলায় যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,
'(হে নবী,) এদের কাছে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং আমিই তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে তেলাওয়াত করা হচ্ছে!' (সূরা আল আনকাবুত, আয়াত ৫১)

হেকমত বা যুক্তির দাবীতে দেখা যায়, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মোজেযা বস্তুগত বা অলৌকিক কোনো কিছুর চেয়ে বরং বিবেকসম্মত এবং সাহিত্য পর্যায়ের হওয়াই ছিলো বাঞ্ছনীয়। যাতে করে এই পৃথিবী যতোদিন টিকে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত যেন এই মোজেযা মানুষের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে টিকে থাকে। নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে এরা একটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করে।

মহানবী (স.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তায়ালা কিছু নিদর্শন এবং মোযেজা দিয়েছেন; সেসব নিদর্শনের সংখ্যা অনুপাতে সেই নবীদের প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যাও ছিলো। আমাকে যে মোজেযা দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে কোরআন। (বুখারী)

৩) এক শ্রেণীর লোক মধ্যম ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে। এরা সকল মোজেযা অস্বীকারও করে না আবার সকল মোজেযা স্বীকারও করে না। এই শ্রেণীর লোকদের মতামতই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এই মতামতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ –

ক. নিঃসন্দেহে কুরআন হচ্ছে রসূল (সাঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ট মোজেযা। এই দুনিয়ার মেয়াদকাল পর্যন্ত এই কোরআন দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ এবং রসূল (সাঃ)-এর সত্যতার বাস্তব প্রমাণ।

খ. এই মোজেযা ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-কে আরো কিছু মোজেযা দিয়েছেন। কিন্তু সেসব মোজেযা চ্যালেঞ্জস্বরূপ বা লোকদের যুক্তি প্রমাণের জন্যে দেয়া হয়নি, বরং এসব মোজেযা ছিলো রসূল (সাঃ)-এর প্রতি মর্যাদাসূচক এবং সাহায্য ও রহমত স্বরূপ। এ কারণেই এ সকল মোজেযা কাফেরদের দাবী অনুযায়ী হয়নি বরং কোনো বিপদের সময়ে এ সকল মোজেযার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন বদরের যুদ্ধের সময় বৃষ্টি হয়েছিলো। সেই বৃষ্টিতে মুমিনরা উপকৃত হয়েছিলো, কাফেররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো। অথচ কাফেররা মুমিনদের চেয়ে মাত্র কয়েক গজ দূরে অবস্থান করছিলো। অথবা উদাহরণ হিসেবে মিরাজের ঘটনার কথা বলা যায়। কোরআন এবং হাদীসে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. সেসকল মোজেযাই আমরা বিশ্বাস করি, যেসব মোজেযার কথা পবিত্র কুরআনে অথবা সহীহ হাদীসে রয়েছে। কুরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা যেসব মোজেযা প্রমাণিত হয়নি আমাদের দৃষ্টিতে সেসব মোজেযার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

নবী হওয়ার আগেই রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ যে মুজেযা দান করেছিলেন

বিশ্ব জাহানের সর্দার, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের মাস রবিউল আউয়াল। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের এই মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় পৃথিবীতে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যা সবাইকে অবাক করে ও শ্রেষ্ঠ নবীর আগমনকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে। এমনই কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো। বিশ্ব নবী (সা.)-এর জন্মের কিছুদিন আগে আবরাহার হস্তী বাহিনীর বিনাশ ঘটে। আসহাবে ফিল অর্থাৎ আবরাহার হস্তী বাহিনী খানায়ে কাবার ওপর আক্রমণ করেছিল এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আবাবিল নামক কিছু ক্ষুদ্র পাখি দ্বারা পরাজিত করেছিলেন। এ ঘটনাটি বিশ্ব নবীর জন্মের বরকতের পটভূমি ছিল বলে সিরাতের কিতাবগুলোতে উল্লেখ রয়েছে।

হজরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.)-এর মা হজরত ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, ‘রাসুল (সা.)-এর জন্মের মুহূর্তে আমি মা আমিনার কাছে ছিলাম। আমি দেখলাম, বিবি আমিনার ঘরটি আলোয় আলোকিত হয়ে গেল এবং আকাশের সব তারকা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আমার মনে হতে লাগল, তারকাগুলো যেন আমার ওপর এসে পড়বে।’ (ফাতহুল বারী : ৬/৭২৬)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, তারকারাজির নিম্নমুখী হয়ে ঝুঁকে পড়ার দ্বারা এই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, অচিরেই পৃথিবী থেকে কুফর ও শিরকের অমানিশা দূর হবে এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোকে এ নিখিলধরা আলোকিত হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে (হেদায়েত) আলো এবং সুস্পষ্ট কিতাব। যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই হেদায়েতের আলোকবর্তিকা ও কিতাবের সাহায্যে শান্তির পথে পরিচালনা করেন এবং তাঁরই অনুমতিক্রমে কুফর, শিরকের অন্ধকার থেকে তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসেন’ (সুরা মায়েদা : ১৫-১৬)। হজরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল (সা.)-এর সম্মানিত মা রাসুল (সা.-এর শুভজন্মক্ষণে এক নূর দেখেন, যার দ্বারা সিরিয়া এলাকার প্রাসাদগুলো উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।’ (মাজমাউ যাওয়ায়েদ : ৮/২২২)

বিশ^নবীর জন্মক্ষণে একদিকে পৃথিবীর মূর্তিশালায় নবুয়তের সূর্যোদয়, অপরদিকে পারস্য সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এই ভূমিকম্পের দরুন রাজপ্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। পারস্যের এক অগ্নিকুণ্ড, যা এক হাজার বছরব্যাপী বিরতিহীনভাবে জ্বলছিল তা সেই শুভ মুহূর্তে হঠাৎ নিভে যায়। সাওয়াহ নামক এক নদীতে যথারীতি পানি প্রবাহিত হচ্ছিল, বিশ^নবীর আগমন মুহূর্তে হঠাৎ তার অথৈ জলরাশি শুকিয়ে যায়’ (সিরাতে মুস্তফা : ১/৬৯)। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল অগ্নিপূজাসহ সব ভ্রান্তির অবসানের ইঙ্গিত।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত, জন্মের সময় বিশ্ব নবীর মায়ের পেট থেকে এমন একটি নূরের বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, যার আলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সবকিছু আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, বিশ্ব নবী (সা.) যখন ভূমিতে আবির্ভূত হলেন তখন উভয় হাতের ওপর ভর দিয়ে ছিলেন। অতঃপর এক মু্ষ্টি মাটি নিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।' (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

হজরত ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আয়শা (রা.) বলেন, 'বিশ্ব নবী (সা.)-এর জন্মগ্রহণের সময় এক ইহুদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মক্কা নগরীতে বসবাস করত। যে রাতে বিশ^নবী পৃথিবীতে আগমন করেন, সে রাত-পরবর্তী সকালে সে কুরাইশদের কাছে জিজ্ঞেস করল, গত রাতে এ এলাকাতে কোনো শিশুর জন্ম হয়েছে কি? উপস্থিত কুরাইশের লোকেরা বলল, এ বিষয়ে আমরা কিছু জানি না। লোকটি বলল, তোমরা এ বিষয়টির অনুসন্ধান করো। কেননা এই রাতে বর্তমান উম্মতের নবী ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিশেষ নিদর্শন (অর্থাৎ মোহরে নবুয়ত) রয়েছে। জন্মের পরপর শিশুটির মুখে জিন আঙুল পুরে রাখার দরুন শিশুটি দুদিন ধরে কারও দুধ পান করবে না। কুরাইশের লোকেরা সন্ধান করে জানতে পারল, আবদুল মুত্তালিবের প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ইহুদিকে এ সংবাদ জানানো হলে সেও শিশুটিকে দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করে বলল, চলো। আমিও শিশুটিকে দেখব। ইহুদি লোকটি যখন শিশুটিকে দেখল এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে মোহরে নবুয়তের নিদর্শনও দেখতে পেল, তখন সে চিৎকার দিয়ে বেঁহুশ হয়ে গেল। হুঁশ ফিরে আসার পর লোকটি বলল, 'নবুয়তে বনি ইসরাইল আজ থেকে শেষ হয়ে গেল। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! ভবিষ্যতে এই শিশু তোমাদের প্রতি এমন এক আক্রমণ পরিচালনা করবে, যার সংবাদ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।' (ফাতহুল বারী : ৬ /৪২৫) এ ছাড়া আরও অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা সিরাতের পাতায়-পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল (দ:) চল্লিশ বছর বয়সে নবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তবে ওহী লাভ আগেই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যা ভবিষ্যতে তাঁর নবী হওয়ার ইশারা দেয়।

রাসূল (দ:) এর জন্মের সময় দাই-মা ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফের মা আশ-শিফা। তিনি বলেন, রাসূল (দ:) যখন তার হাতে জন্মান ও হাঁচি দেন, তখন তিনি স্প ষ্ট শুনতে পান কেউ একজন বলছে, আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি আরো বলেন , পুরো পৃথিবী যেন আলোকময় হয়ে গিয়েছিল (আবু নায়ীম)।

রাসূল (দ:) যখন পথ চলতেন, তখন সবসময় তাঁর উপর ছায়া থাকতো। রাসূল (দ:) এর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা (র:) বলেন , তিনি দেখেছিলেন দু'জন ফিরিশতা তাঁর স্বামীকে পথ চলার সময় ঢেকে রেখেছিলেন (ইবনে সাদ)।

রাসূল (দ:) এর দাই-মা বণী সাদ ইবনে বাকর গোত্রের বিবি হালিমা বলেন, নবী (দ:) যখন তার সাথে ছিলেন, তখন তিনি দেখেছেন মেঘ তাঁকে সবসময় ছায়া দিতো।

এক সফরে রাসূল (দ:) বিশ্রাম নেয়ার জন্য এক শুকনো গাছের নীচে বসেন। গাছটি সতেজ হয়ে বেড়ে উঠে ও প্রচলিত বর্ণনা মতে গাছের ছায়া বেড়ে গিয়ে রাসূল (দ:) কে ঢেকে রাখে। গাছটির আশেপাশের গাছগুলিও সতেজ, সবুজ হয়ে উঠে।

নবী হওয়ার সময় যখন কাছেই, তখন হযরত (দ:) স্বপ্নে যা দেখতেন, তা-ই সত্য হতো। হাদীস থেকে জানা যায়, প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত হযরত (দ:) এ ধরণের স্বপ্ন দেখেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল বুখারী এ সব স্বপ্নের বিবরণ তার বইতে দিয়েছেন। আয়েশা (র:) বলেন , ওহী নাজিল হওয়ার সময় যখন এসেছিল তখন হযরত (দ:) সবসময়ই স্বপ্নে যা দেখতেন তা সত্য হতো। এমনটি কখনো হয় নি যে তিনি ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নে যা দেখেছেন তা ঘটে নি (বুখারী)।

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, হযরত (দ:) এর এ ধরণের স্বপ্ন দেখার কারণ হলো রাসূল হওয়ার গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো।

অলৌকিক ওহী

হযরত (দ:) কে আল্লাহর তরফ থেকে যে সব মুযেজা দান করা হয়, নি:সন্দেহে সেসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য হযরত (দ:) কে নির্বাচিত করেন। এটি ছিল এক বিরাট দায়িত্ব যে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

'হে বস্ত্রাবৃত! রাত জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল। দিনে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।'
(সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত ১-৮)

স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ঘটনা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওহী নাজিল হলো। স্বপ্ন দেখার পর থেকে হযরত (দ:) জাবল-এ-নূর পাহাড়ের হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান করা শুরু করলেন।

এই পাহাড়টি মক্কা থেকে ১২ কিলোমিটারের দূরে। এক রমজান মাসে হযরত (দ:) যখন হেরা গুহায় একা, তখন জিবরাইল (আ:) তাঁকে দেখা দিয়ে আল্লাহর আদেশ শোনালো- পড়ো। হযরত (দ:) এর বয়স তখন ৪০। এই ঘটনাগুলি হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে -

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু বুকায়র (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

তারপর খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, পড়ুন'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আমি বললাম, আমি পড়িনা'। তিনি বলেনঃ তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন'। আমি বললামঃ আমি তো পড়ি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হল। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, আমিতো পড়িনা'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের

নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন আর আপনার রব্ মহামহিমান্বিত।” (৯৬:১-৩)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্ত খুওয়ালিদের কাছে এসে বললেন, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও। ’ তাঁরা তাঁকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হল। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ) এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।
এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফিল ইবনু আবদুল আসা’দ ইবনু আবদুল উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহ্‌র তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন।

তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ্ মূসা আলাইহিস সালাম এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দেবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাঁরা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যিনই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

ইবনু শিহাব (রহঃ) … জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমিনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তারপর আল্লাহ তা’আলা নাযিল করলেন, হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবানী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন (৭৪: ১-৪) । এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল।
(বুখারী, হাদিস নাম্বার ৩)

নবীর (দ:) কাছে ওহী নাজিল ও জিবরাইল (আ:) এর সাথে দেখা হওয়ার ঘটনা কুরআনের একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন -

"তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়, এবং সে মনগড়া কথাও বলেনা। এটাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী। প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন। যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে?"
(সূরা নাজম, আয়াত ২-১২)

আরো কিছু আয়াত আছে যাতে এই সত্যতার সমর্থন পাওয়া যায় যে জিবরাইল (আ:) আল্লাহর তরফ থেকে কুরআন নবীর (দ:) কাছে নিয়ে আসেন। এই সব আয়াতে জিবরাইল (আ:) কে বলা হয়েছে পবিত্র বা বিশ্বাসী আত্মা।

'তুমি বলঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববতী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে।' (সূরা বাকারা, আয়াত ৯৭)

'তুমি বলঃ তোমার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পনকারীদের জন্য।' (সূরা নাহাল, আয়াত ১০২)

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শুয়ারা, আয়াত ১৯২-১৯৪)

সুরা শুয়ারার আয়াতটিতে বলা হয়েছে কুরআন নাজিল হয়েছে হযরত (দ:) এর অন্তরে। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত। কুরআনে আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন-

'এটা প্রত্যাহার না করা তোমার রবের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁর মহা অনুগ্রহ।' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৮৭)

'তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটাতো শুধু তোমার রবের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সাহায্যকারী হয়োনা।' (সূরা কাসাস, আয়াত ৮৬)

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর। এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা **মুদাসসির, আয়াত ১-৩**)

কুরআনের এসব আয়াত আসার পর আল্লাহর আদেশ হযরত (দ:) মেনে নিলেন ও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব শুরু করলেন। এরপর একনাগাড়ে ২৩ বছর ধরে ওহী আসলো হযরত (দ:) এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

ওহী গ্রহণের সময় হযরত (দ:) এর অবস্থা : ওহী যখন আসতো, তখন নবীর (দ:) অনুভূতি কেমন হতো তা হাদীসে বলা হয়েছে। ওহী গ্রহণের সময় উপস্থিত সাহাবীরা বলেছেন, তারা মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মতো শব্দ শুনতে পেতেন। বেশ কিছু হাদীসে নবীর (দ:) শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা এসেছে। আয়শা (রা:) বলেন - রাসূল (দ:) এর কাছে আল হারিথ ইবনে হিশাম জানতে চান - ওহী কিভাবে আপনার কাছে আসে? রাসূল (দ:) বলেন, ফিরিশতা যখন আমার কাছে আসেন, তখন কখনো আমি এমন কণ্ঠস্বর শুনি যা অনেকটা ঘন্টাধ্বনির মতো। এই অবস্থা যখন শেষ হয়, তখন আমি মনে করতে পারি ফিরিশতা কী বলেছিলেন। এই ধরণের ওহী নাজিল আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন বোধ হতো। কখনো ফিরিশতা মানুষের রম্নপ ধরে এসে কথা বলতেন। আমি তা বুঝতে ও মনে রাখতে পারতাম (বুখারী) ।

আয়শা (র:) বলেন- এক শীতের দিনে আমি দেখেছি রাসূল (দ:) ওহী গ্রহণ করছেন আর কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে (বুখারী ও তিরমিজী) ।

রাসূল (দ:) এর অন্তরের অন্ত:স্থলে কুরআনকে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল**:** কুরআন নাজিল হয় রাসূল (দ:) এর হৃদয়ের গভীরে - ২৩ বছর ধরে আল্লাহ রাসূল (দ:) এর উপর কুরআন নাজিল করেন। কুরআন রাসূল (দ:) এর অন্তরকে মজবুত করে তোলে।

'কাফিরেরা বলেঃ সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলনা কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমার হৃদয় ওর দ্বারা মযবূত হয় এবং তা সম্পূর্ণ রুপে আস্তে আস্তে আত্মস্থ করতে পার।' (সূরা **ফুরকান**, আয়াত ৩২)

ওহী নাজিল হওয়ার পুরোটা সময় জুড়েই আল্লাহ তাঁর রাসূল (দ:) কে সমর্থন জুগিয়েছেন ও মানুষের কাছে সঠিকভাবে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন। কিভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে , সে সম্প র্কে আলস্নাহ তাঁর রাসূল (দ:) কে উপদেশ দিয়েছেন।

'তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহবা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন করনা। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করাই তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।' (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ১৬-১৯)

'আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি কুরআনের আয়াত সম্পূর্ণ হবার পূর্বে তুমি ত্বরা করনা এবং বলঃ হে আমার রাব্ব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন।' (সূরা ত্বহা, আয়াত ১১৪)

আল্লাহ রাসূলকে সাহায্য করেছেন কুরআনের আয়াত স্মৃতিতে ধরে রাখতে।

'অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা' (সূরা আ'লা, আয়াত ৬)

কুরআনের সব আয়াত মনে রাখতে পারাটা রাসূল (দ:) এর প্রতি আল্লাহর একটি মুযেজা দান। দরকার মতো কুরআনের আয়াত মনে করতে পারার জন্য দীনের দাওয়াত দেয়াটা রাসূল (দ:) এর জন্য সহজ হয়েছিল।

আমি তোমার জন্য কল্যাণের পথকে সহজ করে দিব। (সূরা আ'লা, আয়াত ৮)

পুরো কুরআন মুখস্ত করতে পারা বা কুরআন স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা আলাহর তরফ থেকে মুযেজা। এর মাধ্যমে কুরআনকে সংরক্ষন করা ও এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে এটি কখনো বিকৃত হবে না বা মানুষ কুরআন ভুলে যাবে না। এই মুযেজা আজো অব্যাহত আছে। অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যারা কুরআনে হাফিজ।

তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার রবের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নেই; তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবেনা। (সূরা কাহফ, আয়াত ২৭)

রাসূল (সাঃ) এর অনন্য মুজেযা পবিত্র কুরআন

কুরআনুল কারীম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিযা। প্রত্যেক নবীর গোত্রের অবস্থা অনুপাতেই তার মুজিযা হয়ে থাকে। এ জন্যই ফেরআউন সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন যাদু বিদ্যা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করলো, তখন মূসা আলাইহিস সালাম এমন একটি লাঠি নিয়ে আসলেন, যা যাদুকরেরা ব্যবহার করতো। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের যাদুকরদের সাপ সদৃশ সব লাঠি গিলে ফেললো। এতে যাদুকররা হয়রান হয়ে গেলো এবং বিস্মিত হলো। তারা বিশ্বাস করে নিলো যে, মূসা আ. যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য-সঠিক; যাদু নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾

''তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলেন। সে তাদের বানোয়াট কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো। তখন সকল যাদুকর সিজদাবনত হয়ে পড়লো এবং বলে উঠলো, আমরা রাববুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। মূসা ও হারুনের রবের প্রতি''। (সূরা শুআরা: ৪৬-৪৮)।

ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে যখন ডাক্তারী বিদ্যা ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল, তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুজিযা নিয়ে আসলেন, যা দেখে সে যুগের ডাক্তারগণ দিশেহারা হয়ে গেলেন। তিনি মৃতদেরকে জীবিত এবং জটিল ও কঠিন রোগ ভালো করতেন। যেমন জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতেন এবং মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিলেই তা আল্লাহর অনুমতিতে পাখি হয়ে যেতো। এতে ডাক্তারদের বিবেক-বুদ্ধি হয়রান হয়ে গেলো এবং তারা স্বীকার করে নিলো যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই।

ঐদিকে আরবরা যখন ফাসাহাত ও বালাগাত তথা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বাগপটুতা ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান দিয়ে ভাষণ-বক্তৃতা দেয়ায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এমন সাহিত্যিক মান সম্পন্ন কুরআনুল কারীম দান করলেন, যার ভাষাগত মান তাদের কথা-বার্তা ও ভাষণ-বক্তৃতায় ব্যবহৃত বাক্যসমূহের বহু উর্ধ্বে এবং যার সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না। আর এ কুরআন হলো সর্বযুগের চিরন্তন মুজিযা।

আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগের সমস্ত মানুষের জন্য সর্বশেষ আসমানী রিসালাত হিসাবে কুরআনুল কারীমকে একটি উজ্জ্বল মুজিযা বানিয়েছেন। প্রত্যেক যামানার লোকেরা কুরআনের মুজিযা প্রত্যক্ষ করছে এবং সেটা তেলাওয়াত করছে। তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কালাম। এটি কোনো মানুষের কালাম নয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনকে কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব অথবা কুরআনের সূরার অনুরূপ দশটি সূরা কিংবা সেটার সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করেছেন।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসাবে প্রেরণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও ইসলামের শত্রুরা কখনো কুরআনের অনুরূপ

একটি কিতাব কিংবা কুরআনের সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করে আনতে পারবেনা। যদিও ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দীন ইসলামের শত্রুর সংখ্যা প্রচুর।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

''আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো আল্লাহকে ছাড়া। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবেনা, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা তৈরি রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য''। (সূরা আল বাকারা: ২৩-২৪)

সুতরাং কুরআনের চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি এখন এমনটি করতে না পারো, নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾

''তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তারা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না। তাদের এ কথার ব্যাপারে তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এ বাণীর মত একটি বাণী তৈরি করে আনুক''। (সূরা তুর: ৩৩-৩৪)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ চ্যালেঞ্জটি ছিল মক্কায়। কেননা সূরা হুদ, সূরা ইউনুস এবং সূরা তুর মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত। মদীনায় হিজরত করার পর এ চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। মাদানী সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

''আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো আল্লাহকে ছাড়া। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি এমনটি না করো আর নিসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবেনা, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর যা তৈরি রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য''। (সূরা আল বাকারা: ২৩-২৪) এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

‘‘কিন্তু তোমরা যদি এমনটি না করো আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর’’। তোমরা যখন এমনটি করতে পারবেনা, তখন জেনে নিবে যে, এটি সত্য। সুতরাং তোমরা তাকে মিথ্যায়ন করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আর তা না করলে, তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে সেই আযাব, যার ওয়াদা করা হয়েছে সত্য অস্বীকার কারীদের জন্য।

(২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَن تَفْعَلُوا ‘‘আর নিঃসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবেনা’’। এখানে لن অব্যয় দ্বারা ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতা অর্জিত হওয়াকে নাকোচ করা হয়েছে। এতে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও তারা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনয়ন করতে পারবেনা। কুরআন এভাবেই সংবাদ প্রদান করেছে।

কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং মুতাওয়াতির হাদীছের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সূরা বানী ইসরাঈল মাক্কী সূরা। ইসরা বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈশ ভ্রমণের মাধ্যমে এ সূরার সূচনা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

‘‘হে নবী তুমি বলো, সমস্ত মানব ও জিন যদি এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না’’। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা আদেশ করেছেন, তিনি যেন সমস্ত সৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করে অকাট্যভাবে এ সংবাদ দিয়ে দেন যে, তারা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করলেও কুরআনের অনুরূপ কিতাব রচনা করতে পারবে না। যদিও তারা এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। সমগ্র সৃষ্টির জন্যই কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ। যারা কুরআন শুনেছে, তাদের প্রত্যেকেই এ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত আছে। কাছের কিংবা দূরের সকলেই এটি শুনেছে। সেই সঙ্গে এটি অবগত হওয়া গেছে যে, কাফেরদের কেউই কুরআনের মোকাবেলা করার সাহস পায়নি এবং কুরআনের অনুরূপ একটি সূরাও আনয়ন করতে পারেনি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করার সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আরবের সকলেই ছিল কাফের। তিনি যখন নবী হিসাবে প্রেরিত হলেন তখন অল্প সংখ্যক লোকই কেবল তার অনুসরণ করলো। কাফেররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং সম্ভাব্য সকল পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। তারা কখনো কখনো আহলে কিতাবদের কাছে গিয়ে গায়েবী বিষয়ে প্রশ্ন শিখে

নিতো। যাতে পরবর্তীতে তারা এ বিষয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে পারে। যেমন তারা প্রশ্ন করেছিল ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে, আসহাফে কাহাফ সম্পর্কে এবং যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে। সেই সঙ্গে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সম্মিলিতভাবে একটি মিথ্যা কথা বলার জন্য একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। তারা তার জন্য একাধিক উদাহরণ পেশ করতে লাগলো। অতঃপর তারা তাকে এমন ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য দিল, যার সাথে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। কখনো তারা তাকে পাগল বলেছে, কখনো যাদুকর বলেছে, কখনো গণক বলেছে এবং কখনো কবি বলেছে। তারা তার সম্পর্কে এমনসব কথা বলেছে, যা তারা নিজেরা এবং প্রত্যেক বিবেকবান লোক শুনে বুঝতে সক্ষম হতো যে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কুরআন যেহেতু তাদের দাবিকে বাতিল করে সেটার মোকাবেলা করার জন্য চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ করেছে, তাই জানা গেলো যে, তারা যদি মোকাবেলা করতে পারতো, তাহলে অবশ্যই তারা তা করতো। সুতরাং চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব কিংবা সেটার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসতো। সমগ্র যমীনবাসীর জন্যই কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সুতরাং প্রত্যেকের কাছেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সমস্ত যমীনবাসী কৌশল কিংবা বিনা কৌশলে এই কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন আনয়ন করতে অক্ষম। কুরআনের মুজিযা ঐসব নিদর্শনের চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ যা কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মৃতদেরকে জীবিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরআনের অনুরূপ মুজিযা আর কোনো নবী আনয়ন করতে পারেনি।

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীর সংখ্যা যখন একদম কমছিল তখন তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে একটি অকাট্য খবর দিয়েছেন যে, সমস্ত জিন এবং ইনসান যদি ঐক্যবদ্ধ হতো তবুও সে যুগে কুরআনের ন্যায় একটি কিতাব রচনা করে আনতে পারতো না। পরবর্তী যুগসমূহেও একই কথা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ কথা বলেছেন। কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে এ ধরণের কথা কেবল ঐ ব্যক্তিই বলতে পারে, যে নিজের মিথ্যাবাদিতা প্রকাশিত হওয়ার ভয় করে এবং অপদস্থ হওয়া ও মানুষ তার কথা সত্যায়ন না করার আশঙ্কা করে। আর যখন দৃঢ়চিত্তে ও পর্বত সদৃশ ঈমান নিয়ে বলবে, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে নিশ্চিত সংবাদ নিয়েই বলবে। মানুষের পরিচিত ও স্বভাবগত যেসব ইলম রয়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু আছে বলে মানুষ জানেনা, যা সমগ্র সৃষ্টি মিলে আনয়ন করতে অক্ষম। আলেমগণ কেবল ঐসব কালাম রচনা করতে অক্ষম, যা তাদের ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং মানুষ যেহেতু কুরআনের অনুরূপ কালাম রচনা করে আনয়ন করতে পারে না, তখন এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা। বিভিন্ন পদ্ধতিতেই কুরআনুল কারীমের মুজিযা প্রমাণ করা যায়। কুরআনের শব্দমালা, গ্রন্থনা, অলঙ্কারপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর প্রতি নির্দেশনা প্রদান, তার আদেশ-নিষেধ, আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর সংবাদ প্রদান, তার ফেরেশতাদের খবরাদি, ভবিষ্যৎ ও অতীতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কিত খবর, পুনরুত্থান দিবস

সংক্রান্ত খবর, ঈমান ও ইয়াকীনের দলীল-প্রমাণাদি এবং অন্যান্য বিষয়েও কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, নবী সা: বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই কোনো না কোনো অতুলনীয় নিদর্শন দেয়া হয়েছে, যার ওপর ঈমান আনা হয়েছে কিংবা লোকেরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে দেয়া হয়েছে অহি, যা আল্লাহ্ আমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, কেয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাদের সবার চেয়ে বেশি হবে (বুখারী)।

কুরআন রাসূলের অনন্য মুজিজা। পবিত্র কুরআনকে কিসের ভিত্তিতে রাসূল সা:-এর মুজেযা অভিহিত করা হয়? এর অলৌকিক দিকগুলো কী কী? কুরআনের কয়েকটি অলৌকিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সতত চির প্রাসঙ্গিক : প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ কিছু মুজিজা দেখানোর সামর্থ্য দিয়েছেন; যা সে-স্থান ও কালেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিটি মুজিজা ছিল অস্থায়ী ও সাময়িক। সে সময় যারা তা প্রত্যক্ষ করেছে শুধু তারাই বিষয়টি অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছে। তবে কুরআনের অলৌকিকতা তার ব্যতিক্রম। রাসূল সা:-এর মুজিজার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, উজ্জ্বল, বহুবিদিত এবং সদাবিদ্যমান মুজিজা হলো পবিত্র কুরআন। চৌদ্দশ বছর অতিক্রমের পরও কুরআন এখনো চির সবুজ ও সজীব। প্রাসঙ্গিক ও দরকারী। কুরআনের অলৌকিক ঘটনা অনন্তকালের। এ অলৌকিক নিদর্শন সগৌরবে মূল ভাষার পূর্ণাঙ্গরূপে বিরাজ করবে কেয়ামত পর্যন্ত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনন্তকাল ধরে এ থেকে লাভ করবে সঠিক জীবনদৃষ্টি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রাচুর্য ও কল্যাণ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্যে ধন্য হবে তাদের জীবন।

অলৌকিক বিষয়বস্তু : পবিত্র কুরআনের সত্যতার উজ্জ্বল দলিল হলো, এর অলৌকিক বিষয়বস্তু। অর্থাৎ এমন এক বাণী যা মানবীয় ক্ষমতার বাইরে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, বলো, 'এ কুরআনের মতো একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জিন একত্র হয় তবুও তারা তার মতো আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৮)।

কুরআনের ব্যাপারে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ এর আগেও কয়েকটি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। কুরআন যখন নাজিল হচ্ছিল তখন আরবি ভাষা উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়। এর শব্দবিন্যাস, বাক্যের বুনন, রচনাশৈলী, ছন্দবদ্ধ গদ্যের সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত শক্তি এবং এর গভীরতা অতুলনীয়। কুরআন নিয়ে যারাই গবেষণা করেছেন, তারা একবাক্যে স্বীকার

করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর ভাষাগত বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত আত্মিক স্বরূপ উভয় দিক দিয়েই এটা অতুলনীয়। এসব বৈশিষ্ট্যকে পরিবেষ্টন করা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। কাফের কবি সাহিত্যিকরাও কুরআন শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে যান। কুরআনের ভাষা ও ভাবের সুউচ্চ মানের অতুলনীয়তার সাক্ষ্য দেন।

অতীতের নানা ঘটনার বর্ণনা : পবিত্র কুরআন মুজিজা হওয়ার আরেকটি দিক হলো, এই কুরআন অতীতের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছে। যেমন আসহাবে কাহাফ, মুসা ও খিজির, জুলকারনাইনের ঘটনা, ইউসুফ এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গের ইতিবৃত্ত, লোকমান এবং তাঁর পুত্রের কাহিনী এবং বহু নবী ও তাঁদের উম্মতগণের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলি। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতগণের শরিয়ত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পৃথিবীর আলোর মুখ দেখার আগেই রাসূল সা: পিতৃহারা হন। ছয় বছর বয়সে মাকে হারান। আট বছর বয়সে আশ্রয়দাতা পিতামহকে হারান। এরপর চাচার কাছে লালিত পালিত হন। পড়াশোনার সুযোগবঞ্চিত কৈশোর কেটেছে মরুভূমিতে মেষ চরিয়ে। একজন মানুষ যিনি নিরক্ষর ছিলেন। পড়তে বা লিখতে পারতেন না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে শুরু করে জীবনের বাঁকবদলকারী বাণীমালা। এই বাণীমালায় তিনি অতীতের নবী রাসূলদের ঘটনা তাদের উম্মতের আখ্যান একের পর এক বলে গেলেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় এ কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান : পবিত্র কুরআন মুজেযা হওয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করা। কুরআনে এমন বিষয়ের সংবাদ জগৎবাসীকে প্রদান করেছে, যা তখনো ঘটেনি। পরবর্তীতে ঘটেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘রোমকরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে’ (সূরা রুম, আয়াত ২-৩)।

এই আয়াতগুলো নাজিল হয় ৬২০ সালে। এই আয়াত নাজিল হওয়ার ঠিক ৭ বছর পর ৬২৭ সালে রোমানরা অবিশ্বাস্যভাবে পারস্যকে পরাজিত করে। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের ইঙ্গিত : পূর্ববর্তী সংবাদ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যেগুলো শুধু তখনই অজানাই ছিল না, সে সময় সেগুলো কল্পনাও করা যেত না।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারো। অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে নিশ্চিতই উদাসীন’ (সূরা ইউনুস, আয়াত ৯২)।

এখানে ফিরাউনকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেবো, যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ তায়ালার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। যে সময়ে এই আয়াতটি নাজিল হয় এবং তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী কেউ জানত না যে ফেরাউনের মৃতদেহ এখনো সেখানে আছে, তবে এই লাশটি কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত এটি কায়রোর জাদুঘরে রয়েছে।

রাসূল (সাঃ) এর অসাধারণ মহৎ চরিত্র – এটাও এক মুজেযা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন (বুখারী হা/৭)। আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' (ক্বলম ৬৮/৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য'।[হাকেম হা/৪২২১] তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' (আহযাব ৩৩/২১)। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে আকাশের তারকারাজি গণনা করা অসম্ভব। তবুও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু চারিত্রিক নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হল।

(১) বাকরীতি **:** তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা 'জাদু' বলত। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান।[মুসলিম হা/৮৬৮] নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও 'তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ'। এমনকি 'হাদীছ জাল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হল তার শব্দসমূহের উচ্চ মানবিশিষ্ট না হওয়া' (ফাৎহুল মুগীছ)। একারণেই আরবী সাহিত্যে কুরআন ও হাদীছের প্রভাব সবার উপরে। বরং বাস্তব কথা এই যে, এই ভাষার বুকে কুরআন ও হাদীছের অবস্থানের কারণেই তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ বাকরীতি ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে পেরেছে এবং ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ হিব্রু, খালেদী, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির পথে।

(২) ক্রোধ দমন শৈলী **:** ক্রোধ দমনের এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বলতেন, প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে।[বুখারী হা/৬১১৪] আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি'।[মুসলিম হা/২৩২৮]

(৩) হাসি-কান্না **:** তিনি মৃদু হাস্য করতেন। কখনোই অট্টহাস্য করতেন না। সদা প্রফুল্ল থাকতেন। কখনোই গোমড়ামুখো থাকতেন না। তবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তার ছাপ চেহারায় পড়ত এবং তখন তিনি ছালাতে রত হতেন।[আবুদাঊদ হা/১৩১৯] ছোটখাট হালকা রসিকতা করতেন।

যেমন, (ক) একদিন স্ত্রী আয়েশার নিকটে এসে তার এক বৃদ্ধা খালা রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে উক্ত মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তখন আয়েশা বললেন, তাদের কি দোষ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়োনি যে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا- عُرُبًا أَتْرَابًا- لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ 'আমরা জান্নাতী নারীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর তাদের চিরকুমারী করেছি'। সদা সোহাগিনী, সমবয়স্কা'। 'ডান সারির লোকদের জন্য' (ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩৫-৩৮)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সী হবে'।[তিরমিযী হা/২৫৪৫]

(খ) এক সফরে তিনি দেখেন যে, মহিলাদের নিয়ে তাঁর কৃষ্ণকায় উষ্ট্রচালক গোলাম আনজাশাহ দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'ধীরে চালাও হে আনজাশা! কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেল না'।[বুখারী হা/৬২১১]

(গ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সঙ্গে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাই আবু ওমায়ের একটি 'নুগায়ের' অর্থাৎ লাল ঠোঁট ওয়ালা চড়ুই জাতীয় পাখি পুষত। যা নিয়ে সে খেলা করত। রাসূল (ছাঃ) যখন এসে তাকে খেলতে দেখতেন, তখন বলতেন, 'হে আবু ওমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের?[বুখারী হা/৬১২৯]

ছালাতের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের ছালাতে তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তর কেঁদে উঠতো এবং তার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। চাচা হামযা, কন্যা যয়নব ও পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত হু হু করে কেঁদেছিলেন। তিনি অন্যের মুখে কুরআন শুনতে পসন্দ করতেন। একবার ইবনু মাসঊদের মুখে সূরা নিসা শুনে তাঁর চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। অতঃপর ৪১ আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকে থামতে বলেন।[বুখারী হা/৫০৫০; মুসলিম হা/৮০০]

(৪) বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা : কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হ'তে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন (আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহোদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিন্তনীয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে দেবার নির্দেশ দাও । তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন'।[বুখারী হা/৬০৮৮; মুসলিম হা/১০৫৭]

উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

(৫) সেবা পরায়ণতা : কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তার জন্য দো'আ করতেন। কি খেতে মন চায় শুনতেন। ক্ষতিকর না হলে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহূদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও পরিচর্যা করেন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল যে তার নিকটে বসা ছিল। বাপ তাকে বলল, 'তুমি আবুল ক্বাসেম-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল (ছাঃ) বের হবার সময় বললেন, 'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[আবুদাঊদ হা/৩০৯৫]

(৬) সহজ পন্থা অবলম্বন : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে যখনই দু'টি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হ'ত, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর জন্য হ'লে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না'।[বুখারী হা/৬১২৬] ওয়ায-নছীহত করতেন, যতক্ষণ না মানুষ বিব্রতবোধ করে।[বুখারী হা/৬৪১১] নফল ছালাত চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, 'তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাধ্যে কুলায়'।[বুখারী হা/১৯৬৬]

(৭) দানশীলতা : যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রামাযান মাসে তা হয়ে যেত 'প্রবহমাণ বায়ুর মত'। তিনি ছাদাক্বা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজের প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যয় করে সবই দান করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'কেউ অতক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য তাই-ই ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে'।[বুখারী হা/১৩] তিনি বলতেন, 'একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।[তিরমিযী হা/১৬৩৩]

(৮) লজ্জাশীলতা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারু মুখের উপর কোন অপছন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম'।[বুখারী হা/৬১০২] কারু কোন মন্দ কাজ দেখলে সরাসরি তাকে মন্দ না বলে

সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পায়। অথচ বিষয়টি বুঝতে পেরে সে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়।

(৯) বিনয় ও নম্রতা : তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। তাঁকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়াতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করতেন।[তিরমিযী হা/২৭৫৪] দাস-দাসীদের নিকটে কখনোই অহংকার প্রকাশ করতেন না। তাদের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উহ্ শব্দটি করতেন না। বরং তাদের কাজে নিজে সাহায্য করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি।[বুখারী হা/৬০৩৮] অবশ্য তার অর্থ এটা নয় যে, অন্যায় কথা বা কাজের জন্য তিনি কাউকে ধমকাতেন না বা ভৎর্সনা করতেন না। যেমন তিনি উসামা ও খালেদকে ধমকিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে তিনি দায়ী নন বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন।[মুসলিম হা/৯৬; বুখারী হা/৪৩৩৯] তিনি সর্বদা আগে সালাম দিতেন ও মুছাফাহার জন্য আগে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছাহাবীগণকে সম্মান করে অথবা আদর করে কখনো কখনো তাদের উপনামে ডাকতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওছমানকে তার উপনামে ‘আবুবকর’, আব্দুর রহমান বিন ছাখারকে ‘আবু হুরায়রা’ (ছোট বিড়ালের বাপ), আলীকে ‘আবু তোরাব’ (ধূলি ধুসরিত), হুযায়ফাকে ‘নাওমান’ (ঘুম কাতর), অতি সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার কারণে আনাসকে ‘যুল উযনাইন’ (দুই কান ওয়ালা), সফরে অধিক বোঝা বহনকারী হিসাবে মুক্তদাস মিহরান বিন ফার্রূখ-কে ‘সাফীনাহ’ (নৌকা) বলে ডাকতেন। উল্লেখ্য যে, খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় রীতি হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(ক) দুগ্ধদায়িনী মা, রোগী, বৃদ্ধ, মুসাফির ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি জামা‘আতে ছালাত সংক্ষেপ করতেন।[বুখারী হা/৭০৩]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর ‘আযবা’ নাম্নী একটা উষ্ট্রী ছিল। সে এতই দ্রুতগামী ছিল যে, কোন বাহন তাকে অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুঈনের সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেল। বিষয়টি মুসলমানদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হ’ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ‘দুনিয়াতে আল্লাহর নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন’।[বুখারী হা/৬৫০১]

(গ) জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে (সৃষ্টির সেরা) বলে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বলেন, ‘তিনি হলেন ইবরাহীম (আঃ)’।[মুসলিম হা/২৩৬৯]

(ঘ) একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহবল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে বলেন, ‘স্থির হও! আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা মাংস ভক্ষণ করতেন’।[ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২] উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা মাংস খেতেন। এ সকল ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

(১০) সংসার জীবনে : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন'।[আহমাদ হা/২৬২৩৭; মিশকাত হা/৫৮২২]

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী ও সবচেয়ে কম বয়স্কা। তাই রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো সাথীদের এগিয়ে দিয়ে নিজে তার সাথে দৌড়ে পাল্লা দিতেন। তাতে আয়েশা জিতে যেতেন। আবার আয়েশা ভারী হয়ে গেলে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান'।[ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৯] তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচ-গান শুনেছেন।[বুখারী হা/৫১৯০] রাসূল (ছাঃ) যে কত বাস্তববাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, এতে তার প্রমাণ মেলে। খায়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নব পরিণীতা স্ত্রী ছাফিইয়াকে উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নীচু হয়ে নিজের হাঁটু পেতে দেন। অতঃপর ছাফিইয়াহ নবীর হাঁটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন'।[বুখারী হা/৪২১১]

(১১) সমাজ জীবনে : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ হ'তে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হতে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেওয়া কষ্টে ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলতেন ও ভালকে ভাল বলতেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থী আচরণ করতেন।[বুখারী হা/৩৯] তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। তাঁর নিকটে লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা (আহমাদ হা/২৩৫৩৬)। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ করো। কেননা তোমরা রূযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে'।[আবুদাঊদ হা/২৫৯৪] অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর।

সমাজ সংস্কারে তিনি জনমতের মূল্যায়ন করতেন। যেমন-

(১) কুরায়েশদের নির্মিত কা'বাগৃহে ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত কা'বাগৃহ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা হয়েছিল। ছাড়া অংশটিকে 'রুকনে হাত্বীম' বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন ওটাকে ইবরাহীমী ভিতের উপর কা'বাগৃহের মধ্যে শামিল করতে এবং কা'বাগৃহের দু'টো দরজা করতে। কিন্তু জনমত বিগড়ে যাবার ভয়ে তিনি তা করেননি। এবিষয়ে তিনি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, 'যদি তোমার কওম নওমুসলিম না হ'ত, তাহ'লে আমি কা'বা ভেঙ্গে দিতাম এবং এর দু'টি দরজা করতাম। একটি দিয়ে মুছল্লীরা প্রবেশ করত এবং অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (৬৪-৭৩ হি.) সেটি করেন'।[বুখারী হা/১২৬]

(২) তিনি সাধ্যপক্ষে উম্মতের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। যেমন মুনাফিকদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন এই

মুনাফিকটাকে (ইবনু উবাইকে) শেষ করে দিই। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, না। তাতে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছেন'।[তিরমিযী হা/৩৩১৫]

(৩) তিনি লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। বৈঠকে তিনি কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। বেদুঈনদের রূঢ় আচরণে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করতেন। বলা চলে যে, তাঁর এই বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'আর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। রাসূল (ছাঃ)-এর এই অনন্য চরিত্র মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিশেষ দান।

রাসূল (সাঃ) এর জীবনের কিছু মুজেযা

মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কর্ম সম্পাদন করাতেন যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। এ সকল কর্ম তাদের নবুয়তের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করত। কোনো নবী মৃতকে জীবিত করেছেন, কেউ জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিরাপদে থেকেছেন। কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত, নিদর্শন বা চিহ্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগের পরিভাষায় এগুলিকে মুজিযা বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ অনেক 'আয়াত' বা মুজিযা দান করেছিলেন। অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ তাঁর সময়ের মানুষেরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউ কেউ ঈমান এনেছে, কেউ অবিশ্বাস করেছেন। পরবর্তী যামানার মানুষেরা তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান নি। তাঁরা শুধুমাত্র এ সকল মুজিযার কথা পড়েছেন বা শুনেছেন।

যেহেতু মুহাম্মাদ (ﷺ) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই আল্লাহ তাঁকে একটি চিরস্থায়ী মুজিযা দান করেছেন, তা হলো পবিত্র কুরআন। আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সূরার অনুকরণে একটি সূরা লিখে পেশ করতে আহবান করেন। তারা তাতে অক্ষম হয়।

আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে স্তব্দ করতে এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে মক্কার কাফিরগণ নিজেদের জীবন ও সম্পদ বাজি রেখেছে। অথচ তাদের জন্য খুবই সহজ ছিল যে, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করে জনসমক্ষে উপস্থিত করে দাবি করা যে, এই দেখ আমরা মুহাম্মাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার জবাব দিয়েছি। যেহেতু জনমত ছিল তাদের পক্ষে এবং অধিকাংশ মানুষই তাদের মতের ছিল সেহেতু মোটামুটি কাছাকাছি একটি সূরা তৈরি করেই তার হৈ চৈ করতে পারত এবং তাদের পক্ষের মানুষদের মনোবল জোরদার করতে পারত। কিন্তু কখনোই তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি। কারণ তারা জানত যে, এতে তাদের পক্ষের আরবদের সামনেই তাদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রচার বৃদ্ধি পাবে।

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা। বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানব জাতি কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পেরেছেন। আধুনিক যুগেও যে সকল অমুসলিম বৈজ্ঞানিক, গবেষক বা পন্ডিত কুরআন অধ্যয়ন করছেন তারাও স্বীকার করছেন যে এই গ্রন্থ কোনো মানুষের রচিত নয়, বরং তা মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। কেউ তাতে ঈমান এনেছেন, কেউ এড়িয়ে গিয়েছেন। এ ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের মানুষ নতুনভাবে এই চিরস্থায়ী মুজিযার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুয়তের সত্যতা বুঝতে পারবে।

এছাড়া মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আরো অনেক মুজিযা দান করেছিলেন যা তাঁর সমসাময়িক মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সকল মুজিযার মধ্যে কিছু মুজিযার বিবরণ

কুরআনে রয়েছে। অন্যান্য মুজিযার বিবরণ হাদীস থেকে জানা যায়। কুরআনে উল্লিখিত মুজিযাগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি মুজিযা:

(১) ইসরা ও মি'রাজ: অলৌকিকভাবে রাত্রিভ্রমন ও ঊর্ধ্বগমনঃ

মহান আল্লাহ কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

''পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরূশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।' [সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল), আয়াত ১]

অন্যত্র সূরা নাজমে আল্লাহ বলেছেন:

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

''সে (মুহাম্মাদ (ﷺ)) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া (অবস্থানের জান্নাত)। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।' [সূরা নাজ্‌ম, আয়াত ১২-১৮]

এ সকল আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। আর 'বান্দা' বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ বলেন: ''তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে?' [সূরা আলাক, আয়াত ৯-১০] অন্যত্র সূরা জিন্ন-এর মধ্যে তিনি বলেন: ''আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হলো তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।' [সূরা জিন, আয়াত ১৯] নিঃসন্দেহে উপরের দুই স্থানেই 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এথেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখানেও 'বান্দা' বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভ্রমন করানোর কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ (নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহন) অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মিরাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুয়তের বিষয়ে সন্দীহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মি'রাজের ঘটনাবালির মধ্যে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা।

(২) চন্দ্র খন্ডিত করাঃ

একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় উপস্থিত ছিলেন। অনেক কাফেরও সেখানে উপস্থিত ছিল। কাফেররা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চাইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আসমানের দিকে তাকাও। তারা আসমানে তাকিয়ে দেখল, চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেছে। মাঝখানে পাহাড়। সমস্ত কাফের ভালো করে দেখার পর পুনরায় চাঁদ এক হয়ে গেছে। কিন্তু হতভাগা কাফেররা এই চাক্ষুষ মুজেজাকেও অস্বীকার করেছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

''কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।' [সূরা কামার, আয়াত ১-২]

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এই ৬ জন সাহাবী থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আলিমগণ এ বিষয়ক হাদীসগুলিকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করেছেন।

এ ছাড়া আরো অগণিত আয়াত বা মুজিযা মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির বিস্তারিত তালিকার জন্যই পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। তাঁর দু'আয় খাদ্যে অলৌকিক বরকতের ঘটনা ঘটেছে অগণিতবার। সামান্য কয়েকটি রুটি দ্বারা শতাধিক মানুষ তৃপ্তির সাথে

আহার করেছেন। সামান্য আধ আজলা পানির মধ্যে তিনি হাত রাখলে আঙুলের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা বের হয় যাতে কয়েক হাজার মানুষের এক বিশাল বাহিনীর সকলেই ওযু-গোসল ও পানি পান করেন। তাঁর দু'আয় মৃত ঝর্ণায় পানির সঞ্চার হয়, মাত্র দু পাত্র পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা হয়, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হয়, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষ তাঁর নির্দেশে পালন করে, কথা বলে ও সাক্ষ্য দেয়। শুষ্ক খেজুরের গুড়ি তাঁর জন্য মানব শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে। তাঁর দু'আয় অন্ধ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করেব, বাকশক্তিহীন কথা বলে, পাগল সুস্থ হয়।

তাঁর অলৌকিক নিদর্শন বা মুজিযার মধ্যে অন্যতম তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে, তাঁর বিভিন্ন সাহাবী সম্পর্কে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যা তার জীবদ্দশায় ও তার পরে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।

হাদিসঃ কোরআনের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় মুজেজা হলো 'হাদিস'। কেননা যেই ব্যক্তি উম্মি তথা যিনি কখনো পড়েননি, লেখেননি বা দুনিয়ার কারো থেকে একটা শব্দও শেখেননি, এমন ব্যক্তির জবান মুবারক দিয়ে গঠনমূলক কথা ও বাণী কীভাবে নিঃসৃত হতে পারে? ইমান-আকিদা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, উত্তম চরিত্র গঠন, সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, আল্লাহর হক, মানুষের হক, দুনিয়া ও আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যেগুলো সারা দুনিয়ার মানুষের ইহকাল ও পরকালের সফলতার মূল সনদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো মানুষ যদি প্রিয় নবী সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে হাদিস থেকে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারবে।

গাছের কান্না : মদীনায় মসজিদে নববীতে মিম্বার তৈরির পূর্বে রাসূল (সা.) পূর্বে একটি গাছের শুকিয়ে যাওয়া কান্ডে ভর দিয়ে তার বক্তব্য ও উপদেশ প্রদান করতেন। পরবর্তীতে তার জন্য একটি মিম্বার নির্মিত হলে তিনি মিম্বারে গিয়ে তার বক্তৃতা দিলেন। এতে গাছের ঐ শুকনো কান্ডটি কাঁদতে থাকে। হাদীসের বিবরনে এসেছে, রাসূল (সা.) মিম্বর থেকে নেমে কান্ডটির উপর তার হাত না রাখা পর্যন্ত এটি কাঁদছিল।

(জাবির রা./বুখারী)

ওযুর পানি **:** হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একবার নামাজের জন্য ওজুর পানির কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। মুসলমানদের কাছে অল্প কিছু পানি জমা করা ছিল, যা সকলের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। রাসূল (সা.) কে তা জানানো হলে, রাসূল (সা.) জমা করা পানিটুকু আনার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তাতে হাত ভেজান এবং পরপরই তার হাত থেকে ঝর্ণার মত পানি প্রবাহিত হতে থাকে। তখন সকলেই সেখান থেকে ওজু করে নেয় এবং তা পান করে নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করে।

(জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা./বুখারী)

বৃষ্টিপাত বন্ধ হওয়াঃ মুহাম্মাদ ইবনু মাহবুব ও খালীফা (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যাক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জুমুআর দিন মদিনায় এল, যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বললোঃ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে আপনি বৃষ্টিপাতের জন্য আপনার রবের নিকট দুআ করুন। তখন আকাশের দিকে তাকালেন তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখছিলাম না। তখন তিনি বৃষ্টিপাতের জন্য দু আ করলেন। এ সময় মেঘ এসে মিলিত হতে লাগলো। তারপর এমন বৃষ্টিপাত হল যে, মদিনার খাল-নালাগুলো প্রবাহিত হতে লাগল এবং ক্রমাগত পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকল, মাঝে আর বিরতি হয়নি।

পরবর্তী জুমুআয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন ঐ ব্যাক্তি অথবা অন্য এক ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো ডুবে গেছি। আপনি আপনার রবের কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। তখন তিনি হেসে দিলেন এবং দু'বার অথবা তিন বার দুআ করলেন। ইয়া আল্লাহ! (বৃষ্টি) আশে পাশে নিয়ে যান, আমাদের উপর নয়। তখন মেঘপুঞ্জ দূর হয়ে গিয়ে মদিনার আশে-পাশে বর্ষণ করতে লাগল। আমাদের উপর আর বর্ষিত হলো না। এতে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজিযা ও তার দুআ কবুল হওয়ার নিদর্শন দেখান।
(বুখারী, হাদিস/ইঃ ফাঃ নাম্বার ৫৬৬৩, আঃ ৬০৯৩)

বোবার নবুওয়াত স্বীকারোক্তি : এক নারী নবীজির নিকট তার এক যুবক ছেলেকে নিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার ছেলে জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কথা বলেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে যুবক বলো আমি কে? সাথে সাথে সে বলে উঠল 'আপনি আল্লাহতা'য়ালার সত্য নবী।' (বাইহাকি শরিফ)।

আঙুলের মাথা দিয়ে পানি বের হওয়া : হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এক হাজার ৫০০ মানুষ খুব পেরেশানিতে ও কষ্টে ছিল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক মগ পানি নিয়ে আসা হলে তার মাঝে নবীজি নিজের হাত মুবারক রেখে দিলেন। তখন নবীজির আঙুল থেকে ঝরনার মতো পানি বের হতে শুরু করে। এরপর সবাই ওজু করেন। পান করেন। নিজেদের প্রয়োজন সেরে নিজ নিজ পাত্রে রেখেও দিলেন। (বুখারি, তিরমিজি)

গাছ ও পাথরের সিজদা করা : শাম দেশের রাস্তায় এক খ্রিস্টান পাদ্রি থাকত। যখন আবু তালেবের কাফেলা সেখানে পৌঁছল, তখন সেই পাদ্রি দেখল রাস্তার উভয় পাশের গাছ ও পাথর সিজদারত অবস্থায় আছে। সে যেহেতু তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলেম ছিল, তাই সে জানত যে গাছ, পাথর নবী ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে না। সে কাফেলার কাছে এলো। সবাইকে দেখল। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর হাত ধরে সে বলল, 'তিনি শেষ নবী'।

গাছ এবং পাহাড়ের সালাম দেওয়া : হজরত আলী (রা.) বলেন, একদা আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কার এক গলিতে যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, যেই পাহাড় ও গাছ সামনে আসছে সেটা থেকেই শব্দ আসছে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ'।

হালিমা সা'দিয়া (রা.)-এর উটনী ও ঘরে বরকত : হজরত হালিমা সা'দিয়া (রা.) বলেন, আমি যখন আমার এলাকার মহিলাদের সাথে মদিনায় যাচ্ছিলাম দুধপানকারী সন্তানের জন্য, তখন আমার উটনীটা ছিল একেবারে দুর্বল ও ক্ষীণকায়। যেটা সবার পেছনে চলছিল। কিন্তু যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম তখন উটনীটা সবল হয়ে গেল। সবার আগে দ্রুত গতিতে চলে আসল। তিনি আরো বলেন, আমার ঘরের বকরিগুলোতে দুধ খুব কম ছিল। একেবারে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে আসলেন তখন আমার বকরিগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমন কি আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বলতে লাগল, আমরাও তো একই জায়গায় বকরি চরাই। আমাদের বকরিগুলোতে তো এত দুধ আসে না।

গাছের কালিমায়ে তাওহিদ পড়া : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। এক গ্রাম্যলোক নবীজির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছো? সে বলল বাড়িতে যাচ্ছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কি নেকির প্রয়োজন আছে? সে বলল, কী নেকি? নবীজি বললেন, কালিমা তাওহিদ বলো। সে বলল, এই কালিমার সাক্ষী আর কে দেয়? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গাছকে ডাক দিলেন। গাছ সাথে সাথে দৌড়ে নবীজির নিকট চলে এল। তিনি (সা.) ওই গাছকে বললেন, তুমি কালিমা বলো। সেই গাছ তিনবার কলিমা বলল। তখন ওই গ্রাম্যলোকটি বলল, আমি বাড়িতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে আসব। আমরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব। যদি সবাই না আসে তাহলে আমি একাই আপনার কাছে চলে আসব। (ইবনে সা'দ)

এক দিনের বাচ্চার নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি : বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইয়ামামাবাসীর এক ব্যক্তি এক বাচ্চা নিয়ে এল। যে বাচ্চা ওই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছে। বাচ্চাকে দেখে নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বাচ্চা বলো আমি কে? বাচ্চা সাথে সাথে বলে উঠল আপনি আল্লাহ তা'য়ালার সত্য নবী ও রাসুল।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো। আল্লাহতা'য়ালা তোমার বয়সে বরকত দান করুন।

অস্তমিত সূর্যকে ফিরিয়ে আনয়ন করাঃ মুহাম্মাদের (সাঃ) অন্যতম অলৌকিক ঘটনা 'রাদ আল শামস' হলো অস্তমিত সূর্যকে ফিরিয়ে আনয়ন করা। আসমা বিনতে ওমায়স থেকে বর্ণিত আছে, একদা মুহাম্মদের খায়বারের কাছে 'সাহবা' নামক স্থানে ছিলেন। তার মাথা মোবারক আলী কোলে রেখে বিশ্রাম করছিলেন। আলী কিন্তু আসরের নামাজ আদায় করেননি। এমতাবস্থায় ওহি নাজিল শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি আসরের নামাজ আদায় করেছ?' আলী বললেন, 'না'। তখনই মুহাম্মদ হস্ত উত্তোলন করে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আলী আপনার রসুলের অনুগত ছিল, সূর্য ফিরিয়ে দিন, যাতে সে আসরের নামাজ সঠিক ওয়াক্তে আদায় করতে পারে।' আসমা বিনতে মায়স বলেন, 'অস্তমিত সূর্য পুনরায় দিগন্তে দৃশ্যমান হলো'। ইমাম তাহাবি মুহাম্মাদের বলেন, 'হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাদিসের সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।' শায়খ জালাল উদ্দীন সুয়ুতী

মুহাম্মাদের উল্লিখিত হাদিসটি সম্পর্কে ‘কাশফুল লাবস আন হাদিসে রদ্দে শামস’ নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। ওই পুস্তিকায় হাদিসের সনদ নিয়ে আলোচনা করে হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন।

মহানবী (সা.) মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কুরাইশদের সম্মুখে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং স্বীয় ভ্রমণকাহিনী ও মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। কুরাইশরা ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসের বিভিন্ন নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ার দিকে যে কাফেলা গমন করেছিল, তারা কখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবে, তা জানতে চেয়েছিল।

মহানবী (সা.) উত্তর দিয়েছিলেন, ‘তারা বুধবার মক্কায় পৌঁছবে।’ বুধবার আস্তে আস্তে অতিক্রান্ত হতে চলল, দিবসের পড়ন্ত বেলাও অতিক্রম হতে চলল। এমনকি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার নিদর্শন পরিলক্ষিত হতে লাগল কিন্তু কাফেলা মক্কায় পৌঁছেনি। তাই মক্কার কাফিরকুল তার নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুরু করে দিল। এমতাবস্থায় রসুলুল্লাহ (সা.) দোয়া করলেন, আল্লাহপাক সূর্যের গতিরোধ করলেন। কাফেলা মক্কায় প্রবেশ করা পর্যন্ত সূর্য থেমে ছিল।

নবীজির (সা.) এর কিছু বরকতময় মোজেজাঃ

প্রত্যেক নবী-রাসুলের ব্যক্তিসত্তা ও গুণাবলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ‘মোজেজা’ তথা অলৌকিক বিষয়াদি। কিন্তু নবীজি (সা.) যেভাবে সব নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন, তেমনিভাবে তার মুজেজার মধ্যেও পূর্ণতা ও বরকতের প্রাচুর্য ছিল। যা অন্যান্য নবী-রাসুলের মুজেজার মধ্যে এত ব্যাপকভাবে ছিল না। যেমন সামান্য খাদ্য, অল্প দুধ ও অপর্যাপ্ত পানি দ্বারা তিনি বিরাটসংখ্যক মানুষের ক্ষুধা নিবারণ, পিপাসা দূরীকরণ ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ প্রদত্ত বরকতময় মুজেজা দ্বারা। এ ধরনের মুজেজার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে।

হজরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা খন্দকের দিন খাল খনন করছিলাম। কাজের মাঝে হঠাৎ একটি কঠিন শক্ত শিলাখণ্ড বের হলো, যা আমরা ভাঙতে পারছিলাম না। তখন সাহাবিরা নবীজি (সা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, একটি কঠিন শক্ত শিলাখণ্ড খন্দকের মধ্যে বের হয়েছে। নবীজি (সা.) বললেন, আমি আসছি। অতঃপর তিনি উঠে এলেন। তখন তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। জাবের (রা.) বলেন, আমরা তিন দিন ধরে না খেয়ে ছিলাম। এরপর এই অবস্থায় নবীজি (সা.) শাবল হাতে নিলেন এবং আঘাত করলেন। ফলে শিলাখণ্ডটি বালুর ঢিবির মতো হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, নবীজি (সা.)-এর এমন অবস্থা দেখেছি, যা সহ্য করা যায় না। তোমার কাছে কিছু খাবার আছে? তিনি বললেন, কিছু আটা ও একটি বকরির বাচ্চা আছে। তিনি বকরির বাচ্চা জবাই করলেন এবং আটা পিষতে লাগলেন। একপর্যায়ে গোশত পাতিলে রাখলাম এবং

আল্লাহর নবীর কাছে গেলাম। এদিকে আটা গরম হচ্ছিল এবং ডেগ চুলার পাথরের ওপর ছিল। প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রাসুল (সা.)-কে বললাম, আমার কাছে অল্পকিছু খাবার আছে। আপনি এবং সঙ্গে এক-দুজন চলুন। নবীজি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, খাবার কী পরিমাণ? আমি নবীজিকে জানালাম। তিনি বললেন, অনেক খাবার, পবিত্র খাবার। তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বল, আমি আসার আগ পর্যন্ত গোশতের ডেগ ও রুটি যেন চুলা থেকে না নামায়। আর সাহাবিদের বললেন, সবাই জাবেরের বাড়িতে চল। অতঃপর মুহাজির ও আনসার সাহাবিরা চললেন। জাবের (রা.) তার স্ত্রীর কাছে বললেন, সর্বনাশ! নবীজি তো মুহাজির, আনসার ও অন্য সাহাবিদের নিয়ে এসেছেন! স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, নবীজি (সা.) কী আপনাকে পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? বললাম হ্যাঁ। তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসুল (সা.) বললেন, তোমরা প্রবেশ করো। ভিড় করো না। এরপর নবীজি (সা.) নিজে রুটি ও গোশত সাহাবাদের মাঝে পরিবেশন করতে শুরু করেন। খাবার বিতরণের সময় নবীজি গোশতের ডেগ ও রুটির চুলা ঢেকে রাখছিলেন। একে একে সব সাহাবিকে নবীজি রুটি ও গোশত পরিবেশন করেন। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাবার খেলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ৮০০, মতান্তরে ১ হাজার। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাবার খাওয়ার পরও কিছু অবশিষ্ট থাকল। নবীজি বললেন, এগুলো তুমি খাও এবং মানুষকে হাদিয়া দাও। কারণ মানুষ ক্ষুধার্ত হয়েছে। (বুখারি : ৪১০১)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, জাবের (রা.) বলেন, আমার মা কিছু খাবার রান্না করে আমাকে বললেন, রাসুল (সা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে দাওয়াত দাও। অতঃপর আমি নবীজি (সা.) এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে বললাম, আমার মা কিছু খাবার রান্না করেছেন। তখন নবীজি (সা.) তাঁর সাহাবিদের বললেন, চলো! এরপর তাঁর সঙ্গে ৫০ জন আমাদের বাড়িতে গেলেন। নবীজি (সা.) বললেন, তোমরা ১০ জন করে ঘরে প্রবেশ করো। তারা খেলেন এবং তৃপ্ত হলেন। আর খাবার পূর্বের মতোই অবশিষ্ট থাকল। (আল খাসায়িসুল কুবরা : ২/৪৯)

একবার নবীজি (সা.) হজরত আবু তালহার ঘরে উম্মে সুলাইম (রা.)-এর রান্না করা কয়েকজনের খাবার দ্বারা প্রায় ১০০ মানুষকে তৃপ্তিসহকারে খাইয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলের কথার স্বর খুব দুর্বল পেলাম। তাঁর মধ্যে ক্ষুধা অনুভব করলাম। তোমার কাছে কি কোনো কিছু আছে? জবাবে উম্মে সুলাইম বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি কয়েকটি আটার রুটি তৈরি করলেন এবং তার একটি কাপড়ে রুটিগুলো প্যাঁচিয়ে আমার কাপড়ে ঢুকিয়ে দিলেন। এরপর আমাকে আল্লাহর রাসুলের কাছে পাঠালেন। আমি তা নিয়ে রাসুলের কাছে গমন করলাম। আমি রাসুল (সা.)-কে মসজিদে বসা পেলাম এবং তাঁর সঙ্গে আরও অনেক মানুষ। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসুল (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি জি বললাম। তিনি বললেন, খাবারের জন্য? আমি জবাব দিলাম, জি। অতঃপর রাসুল (সা.) তাঁর সঙ্গে থাকা সবাইকে বললেন, চলো! আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি চলতে লাগলেন। আমি তাঁদের সামনে চলছিলাম। চলতে চলতে এক পর্যায়ে আবু তালহার কাছে চলে এলাম। তাকে বিষয়টির সংবাদ দিলাম। তখন আবু তালহা বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসুল (সা.) সবাইকে সঙ্গে নিয়ে

এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে তাদের খাওয়ানোর মতো খাদ্য নেই। উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। আনাস বলেন, অতঃপর আবু তালহা গিয়ে রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসুল (সা.) তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হলেন। এমনকি উভয়ে প্রবেশ করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার যা আছে তা আনো। উম্মে সুলাইম ওই রুটিগুলো আনলেন। রাসুল (সা.)-এর আদেশমতো রুটিগুলো ছিঁড়ে ছোট ছোট করা হলো এবং তাতে মধু ও তরকারি দিলেন। অতঃপর রাসুল (সা.) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যা পড়ার পড়লেন। এরপর বললেন, ১০ জনকে আসার অনুমতি দাও। তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো। তারা খেলেন, তৃপ্ত হলেন এবং বের হয়ে গেলেন। এরপর বললেন, আরও ১০ জনকে অনুমতি দাও। এভাবে সবাই খেলেন এবং তৃপ্ত হলেন। আর সেখানে মানুষ ছিলেন ৭০ জন অথবা ৮০ জন। (বুখারি : ৬৬৮৮)

নবীজি (সা.)-এর আরও একটি মুজেজা হলো, হুদায়বিয়াতে কূপের পানি। সেই কূপে পানি ছিল না। তিনি তাঁর অজুর অবশিষ্ট পানি শুকনো কূপে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝরনার মতো পানি এসে ভরে গেল। যার পানি ১ হাজার ৫০০ মানুষ নিজেরা খেয়েছেন, ব্যবহার করেছেন এবং পশুকে খাইয়েছেন (সিরাতে মুস্তফা : ৩/৪৭২)। একবার মহানবী (সা.)-এর সেনাবাহিনীতে সাহাবিদের পানি সংকট দেখা দিল। তিনি তাঁর অজুর ছোট পাত্রে যেখানে ভালোভাবে পুরো হাত ঢোকানো যায় না, তিনি তাতে হাত মুবারক রাখলেন। তাঁর হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে পানি বের হতে লাগল যে, সব সাহাবি পান করলেন ও অজু করলেন। তাবুকে একবার কূপ শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর অজুর অবশিষ্ট পানি তাতে ঢেলে দিলেন। তখন এত ব্যাপক হারে পানি এসে কূপ ভর্তি হয়ে গেল যে, সবাই পানি ব্যবহার করে তৃপ্তি লাভ করলেন। একবার নবীজি (সা.)-এর দরবারে এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। তখন আবু হুরায়রাকে হুকুম দিলেন- সুফফার অধিবাসী সবাইকে ডেকে আনো। তাদের সংখ্যা তখন ৭০ থেকে ৮০ জনের মধ্যে ছিল। এত ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুধার্ত সাহাবি তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। তারপরও পেয়ালায় পূর্বের পরিমাণ দুধ অবশিষ্ট ছিল। (সিরাতে মুস্তফা : ৩/৪৭২)

ইয়া'লা ইবনু মুররাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে এমন কিছু দেখেছি যা আমার পূর্বে ও পরে অন্য কেউ দেখেনি। একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক সফরে বের হ'লাম। কিছু পথ চলার পর আমরা রাস্তায় বসে থাকা এক মহিলাকে অতিক্রম করলাম। তার সাথে তার ছোট শিশু ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এই যে আমার সন্তান, তাকে বিপদ পেয়ে বসেছে। তার কারণে আমরাও বিপদে নিমজ্জিত। আমার জানা নেই, তাকে দিনে কত বার আক্রমণ করে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এই যে আমার সন্তান, তার পাগলামী রয়েছে। সাত বছর ধরে শয়তান তাকে প্রত্যহ দু'বার করে আক্রমণ করে। তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিয়ে এসে তাঁর বাহন বরাবর উঁচু করে ধরলাম। তিনি তার দু'হাত ধরে তিনবার ফুঁক দিয়ে বললেন, (بِسْمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ) 'আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর বান্দা, হে আল্লাহর শত্রু দূর হও'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমি আল্লাহর রাসূল বলছি, হে আল্লাহর শত্রু দূর হও'। অতঃপর তিনি তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ফিরে আসার পথে এই স্থানে তুমি

আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তার কর্মকান্ডের সংবাদ দিবে। (অন্য বর্ণনায় আছে, তোমার সন্তান গ্রহণ কর, এখন তার কোন রোগ নেই। আর যেটা তার হচ্ছিল তা আর ফিরে আসবে না *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৬৫)*। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম। আমরা ফিরে আসার সময় তাকে সে স্থানে তিনটি ছাগল (অন্য বর্ণনায়) ঘি ও পনির সহ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার ছেলের কী অবস্থা? সে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, এ পর্যন্ত আমরা তার থেকে আর কোন কিছু অনুভব করিনি। অতএব আপনি এ ছাগলগুলো মজুরী হিসাবে গ্রহণ করুন। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, যাও ঘি, পনির এবং একটি ছাগল গ্রহণ করে বাকীগুলো ফেরত দাও। রাবী বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জাববানাহ এলাকায় বের হ'লাম। সেখানে পৌঁছলে আমরা প্রাকৃতিক হাজত সম্পন্ন করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, লক্ষ্য করে দেখো এমন কিছু আছে কি যা আমাকে পর্দা করবে? আমি বললাম, আমি একটি গাছ ব্যতীত এমন কিছু দেখছি না, যা দ্বারা আপনি নিজেকে পর্দা করবেন। তিনি বললেন, সেটির নিকটে কি আছে? আমি বললাম, তার মতো বা অনুরূপ একটি গাছ আছে। তিনি বললেন, তুমি সেটির কাছে গিয়ে বল যে, রাসূল (ছাঃ) তোমাদেরকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর গাছ দু'টি একত্রিত হয়ে গেল। তিনি সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করে ফিরে আসলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, ঐ গাছ দু'টির নিকট গিয়ে বল যে, রাসূল (ছাঃ) তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের স্বস্থানে ফিরে যাবে। আমি তাই করলাম। সেগুলো স্বস্থানে ফিরে গেল। একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ করে একটি উট দ্রুত গতিতে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে তার ঘাড়ের সামনের অংশ ঝুঁকাতে থাকল। তখন এটির চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, এর মালিককে খুঁজে বের কর। কারণ এর সাথে বিশেষ ঘটনা জড়িত। আমি তার মালিককে খুঁজতে বের হ'লাম। খুঁজে দেখলাম যে, এর মালিক একজন আনছার ছাহাবী। আমি তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ডেকে নিয়ে আসলে তিনি বললেন, তোমার এই উটটির ঘটনা কি? সে বলল, আল্লাহর কসম আমি তার কোন কিছু জানি না। আমরা তাকে কাজ করিয়েছি, পানি বহন করিয়ে নিয়েছি। এখন এটি পানি বহন করা থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই আমরা গত রাতে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তাকে যবেহ করে নিজেদের মাঝে গোশত ভাগ করে নিব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এটা কর না। এটি আমাকে দান করে দাও। অন্যথা আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! বরং এটি আপনার জন্য। অতঃপর সেটিকে ছাদাকার উটের আলামত লাগিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল *(আহমাদ হা/১৭৫৮৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) উটের মালিককে বললেন, তোমার উটের কি হয়েছে যে, সে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে? সে বলছে যে, তুমি তাকে দিয়ে বিশ বছর পানি বহন করিয়ে নিয়েছ, আর এখন সে বার্ধ্যকে উপনীত হয়েছে। অথচ তোমরা তাকে এখন যবেহ করার সংকল্প করেছ। মালিক বলল, আপনি সত্যই বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি তা করার সংকল্প করেছিলাম। আল্লাহর কসম! আমি তা করব না *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৫৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল বললেন, তোমরা কি জান এই উটটি কি বলছে? সে বলছে, যে তার মালিক তাকে যবেহ করতে চায়।

বর্ণনাকারী বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। অতঃপর আমরা এক স্থানে অবতরণ করলাম। নবী করীম (ছাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে একটি বৃক্ষ যমীন ফেড়ে তাঁর নিকট এসে তাঁকে আচ্ছাদন করে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সেটি স্বস্থানে ফিরে গেল। তিনি জাগ্রত হ'লে আমি তাঁর কাছে বৃক্ষের ঘটনা শুনালাম। তখন তিনি বললেন, এটি একটি গাছ সে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দেওয়ার জন্য তার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলে সে এখানে এসেছিল *(আহমাদ হা/১৭৫৮৩; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৪১২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৫৬, ১৪১৫৭, ১৪১৫৮; মিশকাত হা/৫৯২২; ছহীহাহ হা/৪৮৫)*।

রাসূল (সাঃ) এর বরকতময় দোয়া

পৃথিবীতে যারা বরকতময় জীবন লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন নবী-রাসুলগণ। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন রহমত ও বরকতের ফল্গুধারা। প্রায় প্রত্যেক নবীই কোনো না কোনোভাবে সিক্ত হয়েছেন সৃষ্টিকর্তার ঐশী শক্তিতে। পবিত্র কুরআনে অনেক নবীর বরকতময় জীবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হজরত ঈসা (আ.) বলেছেন, ‘আমি যেখানেই থাকি আমাকে বরকতময় বানানো হয়েছে’ (সুরা মারিয়াম : ৩১)। বিশেষ করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবন পুরোটাই ছিল বরকতময়। আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা.)-কে যেসব মুজেজা দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো, তার দোয়া কবুল হওয়া। নবীজি (সা.) যখন যে দোয়া করতেন তাই কবুল হতো। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবীজি (সা.)-এর দোয়ার মাধ্যমে কল্যাণ ও বরকত হাসিল করতেন।

নবীজি (সা.) যখন কারও জন্য দোয়া করতেন, তিনি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ লাভ করতেন। আর যখন কোনো সম্পদ বা খাদ্যের জন্য দোয়া করতেন, সেই সম্পদ বা খাদ্যে বরকত দেওয়া হতো। হাদিসে এসেছে-আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ‘আমি কিছু খেজুর আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থাপন করে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি এতে বরকত দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। অতঃপর নবীজি (সা.) খেজুরগুলো হাতে নিয়ে আমার জন্য তাতে বরকতের দোয়া করলেন এবং আমাকে বললেন, তোমার খেজুরগুলো নিয়ে যাও ও তোমার খাবারের থলেতে রেখে দাও। যখন তুমি তার থেকে কোনো খেজুর নিতে চাইবে, তখন থলেতে হাত ঢুকিয়ে তা নেবে। থলে একদম খালি করবে না এবং ঝেড়ে ফেলবে না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি সেই খেজুর থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বহু খেজুর পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছি (কোনো বর্ণনায় ২০০ ওয়াসাক) আবার কোনো বর্ণনায় ৫০ ওয়াসাক খেজুর গ্রহণ করার কথা এসেছে (১ ওয়াসাক প্রায় ১৮০ কিলোগ্রাম)। আমি ও আমার পরিবার তা খেতাম এবং সঙ্গীদেরও খাওয়াতাম। আর সেই ব্যাগ আমার কোমরের রশিতে বাঁধা থাকত। হজরত উসমান (রা.) হত্যার দিন তা পড়ে যায় এবং হারিয়ে যায়।’ (তিরমিজি : ৩৮৩৯)

নবীজির দোয়ার মাধ্যমে কল্যাণ, বরকত ও প্রাচুর্য লাভের ঘটনা সাহাবিদের জীবনে বহুবার ঘটেছে। হজরত আনাস (রা.)-এর জন্য নবীজি (সা.) দোয়া করেছিলেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তার দারিদ্র্য দূর করে তাকে ধনী বানিয়ে দেন। নবীজির দোয়ায় তিনি আজীবনের জন্য ধনী হয়েছিলেন। নবী করিম (সা.)-এর দোয়ার বরকতে সাহাবি হজরত আবদুর রহমান (রা.) সাধারণ অবস্থা থেকে কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। হজরত সাদ (রা.)-এর জন্য নবীজি দোয়া করেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি সাদের দোয়া কবুল করে নিন।’ এরপর হজরত সাদ (রা.) আল্লাহর কাছে যে দোয়া করতেন আল্লাহ তা কবুল করতেন। হিজরতের সময় নবীজি (সা.)-এর পেছনে শত্রু হিসেবে সুরাকা অগ্রসর হচ্ছিল। এক পর্যায়ে নবীজির নিকটবর্তী হলে তিনি দোয়া করেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! সুরাকার ঘোড়াকে জমিনে দাবিয়ে দিন।’ সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে যায়। যখন সুরাকা ঈমান এনে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং নবীজি পুনরায় দোয়া করেন তখন ঘোড়া জমিন থেকে বের হয়।

নবীজি (সা.)-এর বরকতময় দোয়ায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন আরেকজন সাহাবি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাল্যবয়সে নবীজি তার জন্য ইলম ও প্রজ্ঞার দোয়া করেছিলেন। যার বরকতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কণ্ঠ দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝরনাধারা জারি হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের তাফসির জগতে তিনি 'রঈসুল মুফাসসিরিন' তথা প্রধান ও শ্রেষ্ঠ তাফসিরকারক হিসেবে অভিহিত হন। শুধু তাই নয়, আবু হুরায়রা (রা.)-এর জন্য নবীজি (সা.) স্মরণশক্তি ও মেধা বৃদ্ধির দোয়া করেছিলেন, যার ফলে পরবর্তী সময়ে আবু হুরায়রা (রা.) যা কিছু শুনতেন, কোনো কিছুই ভুলতেন না। তার মেধা তীক্ষ্ণ ও প্রখর হয়েছিল

নবীজি (সা.) আবু হুরায়রার মায়ের জন্য ঈমান ও হেদায়েতের দোয়া করেছিলেন, ফলে তিনি হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া মদিনায় একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল। জুমার দিনে খুতবার সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আবেদন করেন। নবীজি (সা.) দোয়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল (সিরাতুল মুস্তফা : ৩/৪৭২-৪৭৪)। নবীজির জীবনে এ রকম বরকতময় দোয়ার বহু ঘটনা রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের নবীজির আদর্শ মেনে জীবন গঠনের তওফিক দিন।

সাওবান (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করে আমার সম্মুখে রেখে দিলেন। অতঃপর আমি এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি। পৃথিবীর যে অংশটুকু গুটিয়ে আমার সম্মুখে রাখা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মতের কর্তৃত্ব পৌঁছবে। আমাকে লাল (স্বর্ণ) ও সাদা (রৌপ্য) দুই প্রকারের গুপ্তধন দেওয়া হয়েছে। আমি আমার উম্মতের জন্য আমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করেছি, যেন তিনি তাদের সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন এবং যেন তিনি তাদের ওপর নিজেদের ছাড়া এমন কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন, যারা তাদের দলকে ভেঙে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ কথা শুনে আমার পালনকর্তা বললেন, হে মুহাম্মদ, আমি যা সিদ্ধান্ত করি তা কখনো পরিবর্তন হয় না, আমি তোমার দোয়া কবুল করেছি। আমি তোমার উম্মতকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য এমন কোনো শত্রুকে চাপিয়ে দেব না, যারা তাদের সমষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক একত্র হয়ে প্রচেষ্টা করে না কেন। তবে মুসলিমরা নিজের মধ্যে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করবে এবং একে অপরকে বন্দি করবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭১৫০)

আলোচ্য হাদিসে মহানবী (সা.) উম্মতে মুহাম্মদিকে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সুসংবাদ দান করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি মুসলিম জাতিকে বৈশ্বিক নেতৃত্ব ও বিশ্বজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ এই জাতিকে পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিজয় দান করবেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে সর্ববিনাশী দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করবেন না। বিশেষত একসঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ হবে না। হয়তো এমন হবে যে পৃথিবীর কোনো একটি মুসলিম ভূখণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, কিন্তু অন্যত্র তার প্রভাব থাকবে না। আল্লাহ মুসলিম জাতির ওপর এমন কোনো আগ্রাসী শক্তি চাপিয়ে দেবেন না, যে মুসলিম জাতিকে সমূলে বিনাশ করবে। তবে মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। তারা পরস্পরের ক্ষতি করবে এবং নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে। আগ্রাসী শক্তি তাদের যত না ক্ষতি করতে পারবে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারবে তাদের স্বজাতির শত্রুরা। মুসলিম

জাতির ব্যাপারে আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস মহানবী (সা.)-এর দোয়ার বরকত ও সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

আবদান রহ: ... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা: বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর ওপর কিছু ঋণ ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করে দিলো। আমি নবী সা:-এর সমীপে এলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী সা: তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। আর তিনি (আমাকে) বলেন, আমরা সকালে তোমার কাছে আসব। তিনি সকালে আমাদের কাছে এলেন এবং বাগানের চার দিকে ঘুরে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের সব ঋণ আদায় করে দিলাম এবং আমার কাছে কিছু অতিরিক্ত খেজুর রয়ে গেল। (সহিহ বুখারি : ২২৩৭)

হজরত আবু হুরায়রা রা: একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি ও সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সা:-এর খিদমতে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছ থেকে যা কিছু শ্রবণ করি এর সব কিছু স্মরণ রাখতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ সা: আমাকে বললেন, তোমার চাদরখানা প্রসারিত করো। অতঃপর আমি প্রসারিত করি। তিনি তাতে ফুঁ দেন ও আমার জন্য দোয়া করেন। তারপর তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি তাঁর থেকে যা কিছু শুনেছি তা ভুলিনি।

হজরত আনাস রা: একজন বিশিষ্ট সাহাবি তিনি মহানবী সা:-এর ১০ বছর খিদমত করেছেন। তার আম্মা উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান একদা মহানবী সা:-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সা:! আপনি আমার ছেলে আনাসের জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সা: তার জন্য দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তানে বরকত দান করুন, তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং তার পাপরাশি ক্ষমা করুন। মহানবী সা:-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে অনেক ধনসম্পদ ও ৭৮ জন মতান্তরে ১২০ জন সন্তান দান করেছিলেন। তার মধ্যে দু'জন কন্যা সন্তান অবশিষ্ট সব পুত্র সন্তান। তিনি ১০৩ মতান্তরে ৯৯ বছর হায়াত পেয়েছিলেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: মহানবী সা:-এর চাচাত ভাই। তার উপাধি মুফাস্‌সির সম্রাট। মহানবী সা: তার জন্য হিকমত, দ্বীনি জ্ঞান ও কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যার জ্ঞান দানের জন্য দোয়া করেন। হে আল্লাহ তায়ালা! আপনি তাকে দ্বীনি ও তাফসির শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞান দান করুন। মহানবী সা:-এর দোয়ার বরকতে অল্প বয়সেই তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এবং কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব-তথ্য সবচেয়ে বেশি বুঝতেন। তার জ্ঞানের কারণে হজরত উমর রা: তাকে অল্প বয়সে মজলিসে শূরার সদস্য করেন।

তায়েফবাসী মহানবী সা:-কে পাথর মেরে আহত করলে তিনি তাদের জন্য বদদোয়া না করে বরং নেকদোয়া করেন। হে আল্লাহ! আমার কাওমকে হেদায়াত দান করুন। তারা বুঝে না, আমি যে নবী তারা চিনে না। মহানবী সা:-এর দোয়ায় তায়েফ এখন সৌদি আরবের মধ্যে সবচেয়ে সবুজ-শ্যামল এলাকা।

সাহাবায়ে কেরাম সাকিফ গোত্রের জন্য বদদোয়া করার অনুরোধ করলে তিনি উল্টা নেকদোয়া করেন। হে আল্লাহ! সাকিফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন। পরবর্তীতে তাদের অনেকে দেহায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিল (মিশকাত, হাদিস নং-৫৯৯৫)। তদ্রুপ দাউস গোত্রের জন্য বদদোয়া করতে বলা হলে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, হে আল্লাহ! দাউস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং হিজরত করার তাওফিক দান করুন (সহিহ বুখারি, মুসলিম, মিশকাত, হাদিস নং-৬০০৫)।

মহানবী সা: একদা দোয়া করেন, আল্লাহুম্মা আয়িয়্যিদিল ইসলামা বি আহাদিল উমাইরাইন- হে আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আমর ইবনে হিশাম উভয়ের মধ্যে যেকোনো একজন দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহ তায়ালা হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষে দোয়া কবুল করেন।

বদর যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে মহানবী সা: দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। যুদ্ধ শুরুর পর দোয়া করেন। হে আল্লাহ, যদি আজ মুসলমানদের এই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ তায়ালা, আপনি কি চান, আজকের পর কখনোই আপনার ইবাদত করা না হোক? হজরত আবু বকর সিদ্দিক তখন বলেন, যথেষ্ট হয়েছে, হে আল্লাহর রাসূল। এবার থামুন (আর রাহিকুল মাখতুম)।

রাসূলুল্লাহ সা:-এর বদদোয়াঃ

মহানবী সা: হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। বদদোয়া করা তার শানের খেলাফ। তারপরও কাফির-মুশরিকদের থেকে কষ্ট পেয়ে তিনি বদদোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইরানের বাদশাহ পারভেজ কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত মহানবী সা:-এর প্রেরিত পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার খবর শুনে তিনি তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন। হে আল্লাহ! আমার পত্রকে যেভাবে টুকরো টুকরো করেছে তার রাজ্যকেও সেভাবে টুকরো টুকরো করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। তার পুত্র তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং-১৫৬৯৩)।

বনু সুলাইমের ৭০ জন লোকের একটি দলকে কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে বনু তামিমের কাছে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে পৌঁছলে প্রতারণার মাধ্যমে রেল ও জাকওয়ান গোত্র ৭০ জন সাহাবিকে নির্মমভাবে শহীদ করে। মহানবী সা:-এ সংবাদ শুনে এক মাস কুনুতে নাজেলা পাঠ করে তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন (বুখারি, হাদিস নং-২৮০১)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত, একদা মহানবী কাবাঘরের পাশে নামাজ আদায় করছিলেন। তখন ওকবা ইবনে আবু মুঈত উটের নাড়িভুঁড়ি এনে মহানবী সা:-এর উভয় কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দেয়। রাসূল সা: নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। খবর পেয়ে হজরত ফাতিমা দৌড়ে এসে পিঠ থেকে তা সরিয়ে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা: তিনবার বলেছিল- আল্লø◌াহুম্মা আলাইকা বি-কুরাইশ- হে আল্লাহ! কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার ওপর।

পরবর্তীতে নাম ধরে বদদোয়া করেন। হে আল্লাহ! আবু জেহেলকে পাকড়াও করুন। ওতবা ইবনে রাবিয়া, শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওলিদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওকবা ইবনে আবু মুইতকে পাকড়াও করুন। তারা সবাই বদরযুদ্ধে নির্মমভাবে নিহত হয় (বুখারি প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪৩)।

নবুওয়াত লাভের আগে মহানবী সা: তাঁর দুই কন্যাকে আবু লাহাবের দুই ছেলের উতবা ও উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের পরে আবু লাহাব তার ছেলেদেরকে বলে, তোমরা মুহাম্মদ সা:-এর কন্যাদের তালাক দিয়ে দাও। অতঃপর তারা তালাক দিয়ে দেয়। উতাইবা জাহেলিয়াতের মধ্যে খুব বেশি অগ্রসর হয়ে যায়। সে একদিন রাসূলুল্লাহ সা:-এর সামনে এসে বলে আমি 'ওয়ান নাজমে ইযাহওয়া, আল্লাযি দানা ফা তাদাল্লøা'- অস্বীকার করছি। এ কথা বলে সে মহানবী সা:-এর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। থুথু তাঁর গায়ে লাগেনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা: তার জন্য বদদোয়া করে বলেন, হে আল্লøাহ! আপনার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর তার ওপর লেলিয়ে দিন। এরপর উতাইবা তার পিতার সাথে সিরিয়া সফরে যায়।

সফরকালে রাতে কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, এখানে রাতে হিংস্র জন্তুর আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার কুরাইশি সাথীদের বলে, আমার ছেলের হিফাজতের ভালো ব্যবস্থা করো। কারণ আমি মুহাম্মদ সা:-এর বদদোয়ার ভয় করি। কাফেলার লোকেরা উতাইবার চারপাশে নিজেদের উটগুলোকে বসিয়ে দেয় এবং তারা নিজেরা ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে একটি বাঘ আসে। উটদের বেষ্টনী ভেদ করে সে উতাইবাকে ধরে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলে (আল ইসবালি ইবনে হাজার, দালায়েলুন নবুওয়াতলি আবি নাঈম আল ইসফাহানি, রাওদুল উনুফলিস সুহাইলি)।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মানুষের বদদোয়া থেকে বাঁচার এবং নেকদোয়া পাওয়ার মতো কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন

আল্লাহর বাণী প্রচার করার অনেক আগে থেকেই রাসূল (দ:) সবার কাছে ‘ আল আমীন ’ বা বিশ্বাসী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এটা তার সত্যবাদিতার স্বীকৃতি দেয়। মক্কার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতো ও নিজেদের সমস্যায় হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর মহত্ব ও ন্যায়পরায়নতার জন্য তাঁকে বিচারক মানতো।

নবী (দ:) ছিলেন বুদ্ধিমান , মুক্ত চিন্তার অধিকারী , সংবেদনশীল ও নিজ দায়িত্বের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও কাজে নির্ভূল। এসব গুণের কারণে তিনি সবারই সম্মান ও ভালবাসা লাভ করেন। অবশ্য যখন রাসূল (দ:) সবাইকে এক আল্লাহর পথে ডাকলেন ও মূর্তি পূজা বাদ দিতে বললেন, তখন কাফিরদের অনেকেরই মনোভাব রাতারাতি বদলে গেল। ন্যায় ও সত্যের পথে ডাকার পর তারা কিভাবে রাসূল (দ:) কে অপমানজনক উত্তর দেয় - কুরআনে তার উল্লেখ আছে :-

“তারা বলে : এই যে তুমি , যার কাছে কুরআন এসেছে , তুমি অবশ্যই পাগল। তুমি যদি সত্যই বলে থাকো , তবে আমাদের কাছে ফিরিশতা আনো না কেন ?”(সুরা হিজর ; ১৫: ৬-৭)।

রাসূল (দ:) কে অপবাদ দেয়া হয় , উপহাস করা হয় ও নানারকম মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে এসব অবস্থার মুখোমুখি হয়েও রাসূল (দ:) শান্তভাবে কুরআনের শিক্ষা প্রচার করতে থাকে। এই শিক্ষা মূর্তি পূজারীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও রাগের জন্ম দেয়। কেননা, সমাজে চালু থাকা বিভিন্ন মিথ্যা ধারণা , অবিচার ও নির্যাতনের এরা ছিল সুবিধাভোগী দল।

এরা ভয় পেল যে যদি ইসলাম সব জায়গায় চালু হয় তবে সমাজে তাদের এখন যে উঁচু মর্যাদা আছে এবং সে সুবিধা ও ধন-সম্প দ তারা ভোগ করছে - সেসব আর থাকবে না। রাসূল (দ:) যে রহমত হিসাবে এসেছেন ও কী মুল্যবান শিক্ষা দিচ্ছেন - এটা কেবল সমাজের অল্প কিছু মানুষই বুঝতে পারলো।

রাসূল (দ:) ও তাঁর অনুসারীদের কষ্ট দিতে ও তাঁদের জীবনকে দুর্বিসহ করতে মূর্তি উপাসকরা সব রকম চেষ্টা চালালো। মুসলমানদের একঘরে করা হলো, শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হলো, এমন কী অনেককে মেরেও ফেলা হলো।

মক্কার লোকেরা এমন শত্রুতার মুখে রাসূল (দ:) ও তাঁর অনুসারীরা মদীনায় হিযরত করতে বাধ্য হন। মদীনার আনসাররা রাসূল (দ:) ও অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে স্বাগত: জানায়। তবে ইয়াহুদীরা খুশীমনে স্বাগত: জানায় নি।

রাসূল (দ:) এর চরিত্রের শক্তিমত্তার বড় প্রমাণ হলো তিনি কখনো বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন নি। মদীনায় রাসূল (দ:) শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক ছিল মুনাফিকরা। তারা ভান করতো যে তারা

বিশ্বাসী এবং রাসূল (দ:) এর কাছে এসে তারা সময় কাটাতো। এরপর তারা কাফিরদের সাথে মিলে রাসূল (দ:) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

রাসূল (দ:) যে সময় সংগ্রাম করছিলেন, তখন বিভিন্ন দল তাঁর প্রচন্ড বিরোধীতা করে। এই চরম শত্রুতার মুখে এটা একটা অলৌকিক ব্যপার যে উহুদের যুদ্ধে কয়েকটি দাঁত হারানো ও আহত হওয়া ছাড়া রাসূল (দ:) এর আর তেমন কোন ক্ষতিই কখনো হয় নি।

কুরআনে আলস্নাহ মানুষের ক্ষতি থেকে রাসূল (দ:) কে রক্ষার কথা দেন : " ... আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফিরদের হেদায়েত করেন না" (সুরা মায়িদাহ ; ৫: ৬৭)। বিভিন্ন মুযেজার মাধ্যমে আল্লাহর এই কথার বাস্তবায়ন ঘটে। কাফির, মূর্তি উপাসক ও মুনাফিকরা রাসূল (দ:) এর ক্ষতি করতে চেষ্টা করতো। তারা রাসূল (দ:) কে খুন করার চেষ্টাও করে কিন্তু সফল হয় নি। তাদের সব ষড়যন্ত্র, সব ফাঁদ ব্যর্থ হয়। মুসলমানরা যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়, তখন আল্লাহ সবসময়ই রাসূল (দ:) কে রক্ষা করেন ও বিশ্বাসীদের তাদের থেকে বড় ও শক্তিশালী কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। এর ফলে বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ় হয় ও অনেক অবিশ্বাসী ইসলাম কবুল করে। রাসূল (দ:) লক্ষ্য পূরণে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন। কুরআনে যেমনটি বলা হয়েছে - এটা একটা মুযেজা।

নবুয়ত লাভের পর মহানবী (সা.) যখন মানুষকে ইসলামের পথে আহবান জানানো শুরু করলেন, তখন নবীজি (সা)-এর প্রতি শত্রুতায় লিপ্ত হয় আরবের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীকে সব শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেন। আর এটা মূলত মহান আল্লাহর অঙ্গীকারেরই অংশ। ইরশাদ হয়েছে,

'আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদের, তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (সুরা হজ, আয়াত ৩৮)

হাদীসে রাসূল (দ:) সম্প র্কে এ বিষয়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে।

১. দোয়া কবুলের মাধ্যমে : কুরাইশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা.) তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করলে তা কবুল হয়। হাদিসে এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন কুরাইশদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তারা তাঁকে মিথ্যাচারী বলল ও তার নাফরমানি করল, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ, ইউসুফ (আ.)-এর সময়ে সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কোরো। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের এমনভাবে গ্রাস করল যে নির্মূল হয়ে গেল সব কিছু; অবশেষে তারা মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করল। তাদের কেউ দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে তার ও আকাশের মাঝে ধোঁয়ার মতোই দেখতে পেত। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৮২৩)

২. ফেরেশতা দ্বারা নিরাপত্তা দান : একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজ আদায় করছিলেন। এমন সময় আবু জাহেল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গর্দানকে পদদলিত করার উদ্দেশে তাঁর কাছে এলো। একটু অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ সে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পেছনে সরে এলো এবং দুই হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে লাগল। এটা দেখে তাকে প্রশ্ন করা হলো, তোমার কী হয়েছে? উত্তরে সে বলল, আমি দেখেছি যে আমার এবং তাঁর মধ্যে আগুনের একটা প্রকাণ্ড খাদক, ভয়াবহ অবস্থা এবং কতগুলো ডানা। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে যদি আমার কাছে আসত, তবে ফেরেশতারা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৯৫৮)

৩. পাহাড়ের ফেরেশতা দ্বারা : মহানবী (সা.) যখন তায়েফ থেকে ফিরছিলেন আল্লাহ তাঁর কাছে পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠান এবং সে এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বলে, হে মুহাম্মদ, এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের ওপর আখশাবাইনকে (তায়েফের দুই প্রান্তের পাহাড়) চাপিয়ে দেব। উত্তরে নবী (সা.) বললেন; বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩২৩১)

৪. দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে : যে রাতে মহানবী (সা.) মদিনার উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়েন, সে রাতেই মক্কার মুশরিক যুবকরা তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘরের চারদিকে ঘেরাও করে। কিন্তু মহানবী (সা.) এক মুঠ ধুলা হাতে নিয়ে সুরা ইয়াসিনের প্রথম ৯ আয়াত পাঠ করেন এবং ধুলা মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। এতে তারা দৃষ্টি হারায় এবং নবীজি (সা.) তাদের চোখের সামনে দিয়ে বের হয়ে যান। (দালায়িলুন নুবুয়ত : ২/৪৬৯)

৫. ঘোড়ার পা ধসিয়ে : আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদিনার দিকে বের হলেন। তখন সুরাকা ইবনে মালিক তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার ওপর বদ্দোয়া করলে তার ঘোড়া জমিনে দেবে গেল। সে বলল, আমার জন্য দোয়া করুন, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) দোয়া করলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০০৯)

৬. মনোযোগ সরিয়ে দিয়ে : আবু বকর (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.)-এর সঙ্গে (সাওর) গুহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি তাদের কেউ পা ওঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দুজন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৬৬৩)

৭. বিষ নিষ্ক্রীয় করে : খায়বার বিজয়ের পর মহানবী (সা.)-কে একজন উহুদি নারী বিষযুক্ত বকরির গোশত খেতে দেয়। নবীজি (সা.) সেই গোশত মুখে দিয়ে চিবিয়ে ফেলে দেন। এই খাবার খেয়ে অপর এক সাহাবির ইন্তেকাল হয়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীকে রক্ষা করলেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩১৬৯)

রাসূল (সাঃ) কে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয়

একমাত্র আল্লাহরই আছে অদৃশ্যের পুরো জ্ঞান। অতীতের খুঁটিনাটি তথ্য থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ সবই জানেন। তিনিই সময় সৃষ্টি করেছেন ও মানুষকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। আল্লাহ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। আল্লাহ জানেন মহাবিশ্বের কোথায় কী ঘটছে ও তিনিই এর নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি সব কিছুর রহস্য জানেন। তিনি তাঁর নির্বাচিত রাসূলদের (দ:) এই জ্ঞানের কিছুটা দান করেন - ততটুকুই যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।

"আল্লাহ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, এই জ্ঞান তিনি আর কাউকে দেন না। তাঁর রাসূল ছাড়া যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট; সে সময় তিনি পাহারা বসান রাসূলের সামনে ও পিছনে

(সুরা জিন ; ৭২: ২৬-২৭)।

কুরআনে বলা আছে হযরত ইউসুফ, ঈসা ও মুহাম্মাদ (দ:) ছিলেন এমন নির্বাচিত রাসূলদের অন্যতম যাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান কিছু দান করা হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল (দ:) এর কাছে বেশ কিছু রহস্য প্রকাশ করেন। রাসূল (দ:) অতীতের এমন কিছু ঘটনার কথা জানতেন যা জানা অন্য কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা সম্পর্কেও জানতেন :

"এ হচ্ছে অদৃশ্যের জ্ঞান যা আমি তোমাকে জানালাম"

(সুরা ইউসুফ ; ১২: ১০২)।

অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ রাসূল (দ:) এর নিজের ক্ষমতার অধীনে ছিল না। এটা একটা মুযেজা যা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। রাসূল (দ:) অদৃশ্য সম্পর্কে ততটুকুই জানতেন যা আল্লাহ নিজ ইচ্ছা মতো তাঁকে জানান। রাসূল (দ:) মাঝে মাঝে মানুষকে এমন কিছু বলতেন যা একমাত্র আল্লাহ ওহী লাভ ছাড়া অন্যভাবে জানা সম্ভব ছিল না। এটা একটা প্রমাণ যে তিনি আসলেই আল্লাহ রাসূল (দ:)। অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পরেও রাসূল (দ:) ছিলেন বিনীত ও অনুগত :

"বলো : আলাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল- মন্দের উপর কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিজের যদি অদৃশ্যের জ্ঞান থাকতো, তাহলে তো আমি প্রচুর কল্যাণ লাভ করতাম আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি কেবল একজন সতর্ককারী আর বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদদাতা"

(সুরা আরাফ; ৭ : ১৮৮)।

হুজুর (সাঃ) অদৃশ্যের জ্ঞান জানতেন। এর প্রমান আমরা এ দ্বারা বুঝতে পারি যে হুজুর (সাঃ) একদিন আবু বাক্কার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন যে তাঁর পর ত্রিস (৩০) বছর খিলাফত হবে। আর সত্যিই হুজুর (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ত্রিশ বছর খেলাফত হয়েছিল। আবু বাক্কার (রাঃ) ২ বছর ৩ মাস ও ১০ দিন খিলাফত করেছিলেন, তিনার পরে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) ১০ বছর ৬ মাস ৮ দিন খিলাফত করেছিলেন, তিনার পরে উসমান বিন আফফান (রাঃ) ১১ বছর ১১ মাস ৯ দিন খিলাফত করেছিলেন, তিনার পরে আলি বিন আবি তালিব ৪ বছর ৯ মাস ৭ দিন খেলাফত করেছিলেন।

এই অনন্য জ্ঞান রাসূল (দ:) লাভ করেন কুরআন ও অন্যান্য ঐশ্বরিক সূত্র থেকে। কিছু জ্ঞান ছিল অল্প দিনের মধ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে যেমন যুদ্ধ জয়ের ভবিষ্যত বাণী। কিছু জ্ঞান ছিল এমন ঘটনা সম্পর্কে যা ঘটবে রাসূল (দ:) এর মৃত্যুর কয়েক বছর পর যেমন কয়েকজন সাহাবীর শহীদ হওয়া। বিশেষ কিছু জ্ঞানও রাসূল (দ:) এর ছিল যেমন কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ - যেগুলি ওহী আসার ১৪০০ বছর পরেও এখনো সবগুলি ঘটে নি - আরো পরে ঘটবে। আল বুখারী, মুসলিম , আবু দাউদ, আর তিরমিযী, আল নাসাই, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা একমত যে হাদীসে রাসূল (দ:) এর কাহিনীতে অদৃশ্যের জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূল (দ:) এমন সব ঘটনা জানতেন যা অন্য কেউ জানতো না। রাসূল (দ:) এমন সব ঘটন ও তথ্য সম্পর্কে জানতেন যা অন্য কারো পক্ষে জানা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। এটা ঘটে কেননা আল্লাহ তাঁর রাসূল (দ:) কে সে সব গোপন কথা জানিয়ে দিতেন।

কুরআনে আল্লাহ এমন একটি ঘটনার কথা উলেস্নখ করেন। রাসূল (দ:) একটি গোপন কথা তাঁর এক স্ত্রীকে বলে কাউকে বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাসূল (দ:) এর স্ত্রী যে কথা অন্য একজনের কাছে ফাঁস করে দেন। আল্লাহ এটি রাসূল (দ:) কে জানান। রাসূল (দ:) যখন তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে তিনি জেনে ফেলেছেন ঘটনাটা। তখন স্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চান রাসূল (দ:) কিভাবে ঘটনাটি জানলেন। রাসূল (দ:) এর উত্তর ছিল আল্লাহই জানিয়েছেন আমাকে।

কুরআনের সুরা তাহরিমে এর উল্লেখ আছে :

“নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপন কথা বলার পর স্ত্রী অন্যকে বলে দিল, আল্লাহ তা নবীকে জানান। নবী এ ব্যপারে স্ত্রীকে কিছু বললো আর কিছু অংশ বললো না। স্ত্রী জানতে চাইলো, আপনাকে কে এসব বলেছে? নবীর উত্তর, যিনি সব জানেন ও সব বিষয়ে অবগত তিনিই আমাকে এটা বলেছেন” (তাহরিম ; ৬৬: ৩)।

আরেকটি ঘটনা : বদর যুদ্ধের পর রাসূল (দ:) এর চাচা আব্বাসকে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে রাসূল (দ:) এর সামনে আনা হয়। চাচা ছিলেন কাফির। তাকে রাসূল (দ:) প্রশ্ন করেন - মুসলিম বাহিনীকে তিনি কী মুক্তিপণ দেবেন ? চাচা জানায় তার কাছে কোন অর্থ নেই। রাসূল (দ:) তখন জানতে চান মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্য রওনা হওয়ার আগে যে অর্থ তিনি স্ত্রী উম্মে আল ফজলকে দিয়ে এসেছেন সেটা কী হলো? আব্বাস অবাক হয়ে জানতে চান কিভাবে রাসূল (দ:) এই অর্থের কথা জানলেন? কেননা, তিনি রাতের বেলা গোপনে স্ত্রীকে তা দিয়েছেন - অন্য কেউ এ সম্প র্কে জানে না। রাসূল (দ:) বলেন যে আলাহ তাঁকে এই কথা জানিয়েছেন। আব্বাস তখন বুঝতে পারে যে মুহাম্মাদ (দ:) সত্যিই আল্লাহর রাসূল (দ:)। তিনি তখনই ইসলাম কবুল করেন (মুসলিম , মুসনাদ আহমাদ)।

আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাজিল করে কিছু মানুষের মনের গোপন কথা ও গোপন আচারআচরণ সম্প র্কে জানান। আল্লাহ মুনাফিকদের মিথ্যা সম্প র্কে ও মুখের কথায় আড়ালে তাদের সত্যিকারের মনোভাব কী - যা কিছুই প্রকাশ করেন। এতে রাসূল (দ:) বুঝতে পারেন সত্যিকারের মুসলমান কারা ও কারা মুনাফিক। ফলে কোন মানুষকে বিশ্বাস করা যায় আর কাকে যায় না, তা রাসূল (দ:) সহজেই বুঝতে পারেন। রাসূল (দ:) ছিলেন মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্ত, তাই আল্লাহর তরফ থেকে এটা ছিল সত্যিই বড় রকমের সাহায্য ও হেফাযত। আল্লাহ রাসূল (দ:) কে আরো জানান তিনি কী বলবেন , কী করবেন :

"অনন্তর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা, যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিল, আর একদল নিজেদের জীবনের জন্য চিন্তা করছিল; তারা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলেছিলঃ এ বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নেই? তুমি বলঃ সকল বিষয়ে আল্লাহর অধিকার। তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা তোমার নিকট প্রকাশ করেনা; তারা বলেঃ যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকতো তাহলে এখানে আমরা নিহত হতামনা। তুমি বলঃ যদি তোমরা তোমাদের গৃহের মধ্যেও থাকতে তবুও যাদের প্রতি মৃত্যু বিধিবদ্ধ হয়েছে তারা নিশ্চয়ই স্বীয় মৃত্যু স্থানে এসে উপস্থিত হত; তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, আল্লাহ তা পরীক্ষা করে থাকেন; এবং আল্লাহ মনের অন্তর্নিহিত ভাব জ্ঞাত আছেন।" (ইমরান ; ৩: ১৫৪)

"আর তারা বলেঃ আমরা অনুগত। কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল, তুমি যা বল তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি নিস্পৃহ হও এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।" (নিসা ; ৪: ৮১)

“যে সব আরাব মরুবাসী গৃহে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবেঃ আমাদের ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বলঃ আল্লাহ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।” (সুরা ফাতহ; ৪৮ : ১১)

“আর কেহ কেহ এমন আছে যারা এ উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনও ওতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবেনা; অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তম রূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তম রূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।” (তওবা ; ৯: ১০৭-১০৮)

মানুষ জানতে চাওয়ার আগেই রাসূল (দ:) উত্তর দিতেন। হাদীসে আছে, মানুষ প্রশ্ন করার আগেই রাসূল (দ:) উত্তর দিয়ে দিতেন। তিনি জানতেন কে তাঁর বাসায় আসবে, কেউ ঘরে ঢুকার আগেই তিনি বলে দিতেন সে সম্প র্কে। কারো কেন দেরী হলো সেটাও তিনি জানতেন। হাদীসে এ ধরণের বহু মুযেজার কথা আছে।

রাসূল (দ:) নিজের মৃত্যুর কথা আগেই সাহাবীদের জানিয়ে রেখেছিলেন। রাসূল (দ:) এর একটি মুযেজা যা আল্লাহ তাঁকে দান করেন তাহলো উনি নিজের ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীর (র:) মৃত্যুর কথা আগে থেকেই জানতেন। হাদীসে আছে রাসূল (দ:) বলেন ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের আগে তিনিই সবার আগে মারা যাবেন।

রাসূল (দ:) কয়েকজন সাহাবীর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যতবাণী করেন : আল্লাহর তরফের মুযেজা হিসাবে রাসূল (দ:) যেমন নিজ মৃত্যুর কথা আগেই বলেন, তেমনি সাহাবীদের মৃত্যুর অনেক আগেই কয়েকজনের মৃত্যুর কথা বলেন। হাদীসে এ ধরণের বহু বর্ণনা আছে। রাসূল (দ:) কয়েকজন সাহাবী শহীদ হবেন ও কোথায় তারা যাবেন সেটাও বলেন।

উমর (রা:) এর মৃত্যুর ভবিষ্যত বাণী :

আনিস বিন মালিক বলেন : রাসূল (দ:) একবার উহুদ পাহাড়ে যান আবু বকর , উমর ও উসমানকে নিয়ে। পাহাড় তখন নড়ে উঠে। রাসূল (দ:) পাহাড়কে বলেন : " থেমে যাও। তোমার উপরে আছেন একজন রাসূল (দ:) , একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ। (বুখারী)

উসমান (রা:) এর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যত বাণীও করেন।

রাসূল (দ:) হযরত আলী (রা:) কে এর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যত বাণী করেন : রাসূল (দ:) আলী (রা:)কে বলেন : মানুষের মধ্যে সে সবচেয়ে দূর্ভাগ্যজনক যে তোমাকে এখানে আঘাত করবে - রাসূল (দ:) ইশারা করলেন (আলীর কপালের দিকে) – যতক্ষণ না রক্তে ডুবে যায় (ইশারা করলেন দাড়ির দিকে)। (আন নাসাই, মুসনাদে আহমাদ)|

হুসেইন (রা:) এর ধর্মযুদ্ধে নিহত হওয়ার ভবিষ্যত বাণী রাসূল (দ:) করে যান।

উমর , উসমান , আলী ও হুসেইন (রা:) সম্পর্কে রাসূল (দ:) এর এসব ভবিষ্যত বাণী একের পর এক সত্য প্রমাণিত হয়।

কুরআনের বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর বিশেষ কিছু এলাকায় বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এসব ভবিষ্যত বাণী করা হয় ঘটনা ঘটার অনেক আগে।

বাইযেনটাইনের জয় :- কুরআনে সুরা রুমের শুরুতে একটি ভবিষ্যত বাণী আছে। এই আয়াতে আল্লাহ বলেন যে , রোমক বা বাইযেনটাইন সম্রাট যুদ্ধে পারসিয়ানদের বিরম্নদ্ধে খুব তাড়াতাড়ি জয়ী হবে :

"আলিফ লাম মীম; রোমানরা হেরে গিয়েছে কাছের এলাকাতে কিন্তু এই পরাজয়ের পর তারা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জয়ী হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাই আল্লাহর এখতিয়ারে। সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে " (সুরা রুম ; ৩০: ১-৪)

রোমানদের বিজয়ের যে ভবিষ্যত বাণী কুরআনে করা হয় তা সাত বছর পর ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে সত্য হয়। ঐ সময় রোমানরা চারিদিক থেকে নানা ধরণের হুমকি মোকাবেলা করছিল।

ইসলামের জন্য মিসর উন্মুক্তকরণ - আবু দার বর্ণনা করেন : রাসূল (দ:) তোমরা খুব তাড়াতাড়িই মিসর জয় করবে। এটা সেই ভূমি যার নামে কিরাত এর নামকরণ হয়েছে। তাই তোমরা যখন মিসর জয় করবে , তখন সেখানকার মানুষদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে (মুসলিম)। এই হাদীসে ইসলামের জন্য মিসরের দ্বার খুলে যাওয়ার ভবিষ্যত বাণী করা হয়। যখন এটা বলা হয়, তখন রোম সম্রাট মিসর শাসন করতেন। মুসলিম বাহিনীর তখন এই ক্ষমতা ছিল না যে তারা রোমান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করবে। রাসূল (দ:) এর ভবিষ্যত বাণী পরে সত্য হয়।

রোম ও পারস্য জয় :- খসরু মারা যাবে ও তার পরে আর কোন খসরু থাকবে না; সিজার মারা যাবে আর তারপরে অন্য সিজার থাকবে না; কিন্তু তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সম্প দ খরচ করবে (মুসলিম)।

খসরু শব্দটি ব্যবহৃত হতো প্রাচীন পারসিক রাজাদের জন্য। সিজার ছিল রোমান সম্রাটদের পদবী। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কেবল বাইযেনটাইন রাজারা এই পদবী ব্যবহার করতো। রাসূল (দ:) ভবিষ্যত বাণী করেন যে এই দুই রাজার ধন-সম্প দ মুসলমানদের অধিকারে আসবে। এই ভবিষ্যত বাণীর সময় পারসিয়ান ও বাইযেনটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের মতো শক্তি মুসলমানদের ছিল না। সামরিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক - কোনদিক থেকেই এই দুই শক্তিশালী বাহিনীর সমকক্ষতা ছিল না মুসলমানদের। পরে সব ভবিষ্যত বাণীই সত্য হয়।

কিয়ামতের আলামত:- অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বেশ কিছু বিষয়ের ভবিষ্যত বাণী রাসূল (দ:) করে যান। তাঁর মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরে আমরা দেখছি অনেক কিছুই এখন ঘটছে।

আনাস ইবনে মালিক বলেন : আমি তোমাদেরকে একটি হাদীসের কথা বলি যা আমি রাসূল (দ:) এর কাছে শুনেছি আর আমার পরে আর কেউ এটা বলবে না। আমি রাসূল (দ:) কে বলতে শুনেছি - কেয়ামতের আলামত হলো জ্ঞান অদৃশ্য হবে ও অজ্ঞতার প্রসার হবে। ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে; মদ খাওয়া সাধারণ ব্যপারে পরিণত হবে; পুরুষের সংখ্যা কমবে ও নারীর সংখ্যা বাড়বে যতক্ষণ না অবস্থা এমন দাড়ায় যে এক পুরুষকে ৫০ মহিলার দেখাশোনা করতে হয়।

আবদুল্লাহ বলেন : রাসূল (দ:) বলেছেন : কেয়ামতের ঠিক আগে আগে এমন সময় আসবে যখন জ্ঞান থাকবে না আর অজ্ঞতা দেখা দিবে চারিদিকে; খুন অনেক বেড়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন : রাসূল (দ:) আমাদের কাছে এসে বললেন : হে মুহাজিরদের দল; যদি পাঁচটি জিনিষ তোমাদের মধ্যে দেখা দেয়, তবে নানাভাবে তোমরা শাস্তি পাবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যাতে তোমরা এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে পারো। কোন দলের মধ্যে অশালীনতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা তারা প্রকাশ্যে নিয়ে আ ; তাহলে প্লেগ তাদের মধ্যে দেখা দেয়; এমন ধরণের অসুখ তাদের হয় যা তাদের আগেকার মানুষদের কখনো হয় নি। যদি তারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাহলে খরা ও ভয়াবহ দু:খ দেখা দিবে ও স্বৈরশাসক তাদের উপর নেতৃত্ব করবে। যদি তারা সম্প ত্তির উপর যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তবে তারা বৃষ্টির রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। যদি জীবজন্তু না থাকতো তাহলে তারা একেবারেই বৃষ্টি পেত না। যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দ:) এর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহলে আল্লাহ বাইরের শত্রুদের মধ্যে থেকে কাউকে তাদের শাসক বানাবেন - যে তাদের যা আছে তা থেকে কিছু দখলে নেবে। শাসকরা যদি আল্লাহর দেয়া আসমানী কিতাবের বিধি-বিধান মেনে না চলে ও নিজ ইচ্ছামতো চলে যার ভিত্তি কুরআনে নেই, তাহলে আল্লাহ তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেবেন। (ইবনে মাজাহ)

উপসংহার

মুযেজা শুধুমাত্র আল্লাহর তরফ থেকে ঘটে। মুযেজা হলো অসাধারণ কিছু যা ঘটানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। মুযেজা যে শুধু রাসূল (সাঃ) এর চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার মতো দৃশ্যমান কোন ঘটনাই হবে -তা নয়। বিভিন্ন নবী ও রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহর সমর্থন দান, বিপদের সময় আল্লাহর তরফ থেকে ওহী ও সাহায্য পাঠানো - এসব সাধারনভাবে যত ছোটই মনে হোক না কেন এগুলিও মুযেজা।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে বিভিন্ন ধরণের মুযেজা দান করা হয় যা তাঁর জীবনের সব ক্ষেত্রে ছাপ ফেলেছে। রাসূল (সাঃ) কে দান করা হয় ব্যতিক্রমধর্মী এক মুযেজা - বায়তুল মুকাদ্দাসে রাত্রিবেলা সফর ও সাত আকাশে ভ্রমণ। এই মুযেজা কেউ চোখে দেখে নি, তবে বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে প্রমাণিত যা বিশ্বাস করতে মানুষ বাধ্য হয়। রাসূল (সাঃ) কে কিছু দৃশ্যমান মুযেজা দান করা হয় যেমন আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া - যা সেই সময়ে বহু লোকজন দেখেছে। এছাড়া, রাসূল (সাঃ) কে ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়। আল্লাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর রাসূল (সাঃ) কে নানাভাবে সাহায্য করেন। এক কথায়, রাসূল (সাঃ) এর জীবন ও চরিত্র, কথা ও প্রার্থনা - সব কিছুই ছিল অনন্য ও রহমতে ভরপুর। রাসূল (সাঃ) এর জীবনের মুযেজাগুলি যেমন ছিল বিচিত্র রকমের, সেগুলি ঘটার কারনও ছিল বিভিন্ন। কিছু মুযেজা ঘটে মুসলমানদের দৃঢ় রাখা ও তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক দুইভাবেই শক্তি, সাহস ও উৎসাহ দেয়ার জন্য। এর একটি উদাহরণ হলো বদরের যুদ্ধে আল্লাহর তরফের সাহায্য। কিছু মুযেজা ঘটে শত্রুর হাত থেকে রাসূল (সাঃ) কে বাঁচানোর জন্য। এটি ঘটে ওহীর মাধ্যমে কাফিরদের ষড়যন্ত্র রাসূল (সাঃ) এর কাছে জানানো থেকে শুরু করে দৃশ্যমান সাহায্য যেমন গুহায় মাকড়সার জাল বোনার মাধ্যমে - যখন রাসূল (সাঃ) সাথীসহ কাফিরদের থেকে পালিয়ে ছিলেন। অন্য কিছু মুযেজা ঘটে এটা প্রমাণ করতে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) সত্যবাদী। তাই তিনি যা বলছেন তাঁর সমর্থনে কিছু মুযেজা ঘটানো হয় যেমন গাছ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ এক ও মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। অনেক সময় মানুষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মুযেজা দান করা হয়। মুযেজার কারণে কিছু মানুষ সত্য পথে আসে, কিছু মানুষ রয়ে যায় কঠিন মন নিয়ে। তারা আল্লাহর এসব নিদর্শনকে যাদুবিদ্যা বলে। এটা আল্লাহর ইচ্ছা যে তিনি চাইলে এমন মুযেজা দেখানো যেতো যাতে সবাই বিশ্বাস আনে।

"আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি।" (সূরা **আশ শুআরা**, আয়াত ৪)

কিন্তু তাহলে আলাহ আমাদেরকে যে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন সেটা তার বিরোধী হতো। কেননা, আল্লাহর দেয়া জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে আমরা বিচার করি কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। মুযেজা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ও

কাফিরদের মধ্যেকার পার্থক্যকে প্রকাশ করে দেয় - কে স্রষ্টায় বিশ্বাসী আর কে সত্য প্রত্যাখানকারী - মুযেজার মাধ্যমে তার প্রমাণ হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেন বিশ্বাসীরা কিভাবে উত্তর দিয়েছিল।

"তারা বলেছিলঃ আপনি পরম পবিত্র! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের কোনই জ্ঞান নেই, নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ৩২)

সব রাসূলকে দেয়া মুযেজাই গূরুত্বপূর্ণ। তবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দান করা মুযেজা একটি বিশেষ বিবেচনায় আলাদা। রাসূল (সাঃ) এর মুযেজা অনেক বেশী মানুষ দেখেছে। মুসা (আ:) ও ঈসা (আ:) এর মুযেজাগুলি শুধুমাত্র তাঁদের সময়ের মানুষ দেখেছে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) যে মুযেজাগুলি লাভ করেছিলেন, সেগুলি এমন কী তাঁর মৃত্যুর পরেও মানুষ দেখেছে। যেমন সাহাবীদের শহীদ হওয়ার ভবিষ্যত বাণী ও কিছু এলাকায় বিজয় লাভ। অবশ্য সবচেয়ে স্থায়ী মুযেজা হলো - যা লক্ষ কোটি মানুষ সারা দুনিয়ায় যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছে - তাহলো পবিত্র কুরআন। নানা দিক থেকেই কুরআন অলৌকিক - যেভাবে এটা নাজিল হয়েছে, যেভাবে এটা সংকলিত হয়েছে ও যেভাবে এটা সংরক্ষিত হয়েছে - সবই অসাধারণ। রাসূল (সাঃ) আমাদের জন্য অলৌকিক কুরআন রেখে গিয়েছেন ঠিক সেভাবেই - যেভাবে এটা তাঁর কাছে নাজিল হয়েছিল।

আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন; একজন তাই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এই মুযেজা পাঠ করবে ও কুরআনের আদর্শকে গ্রহণ করবে অথবা ত্যাগ করে এই মুযেজাকে অস্বীকার করবে।

"আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, এবং যে কেহ এটা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১২১)